প্রকাশিকা :
শাওনি ঘোষ
কাঁচরাপাড়া
২৪ পরগণা

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ. কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

বাংলাদেশের মাঠ-ময়দানকে
যাঁরা প্রাণবন্ত করে রেখেছেন—

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া

পশ্চিমবঙ্গ কবাডি অ্যাসোসিয়েশন

আনন্দ বাজার পত্রিকা, বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা

নিখিল ভট্টাচার্য

মনোজিৎ চন্দ

১৯৪৭এর ৯ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি—মাত্র ১৭ দিনের বাংলাদেশ সফর। তাও ফুটবল, ক্রিকেট, হকির-মত কোনো জনপ্রিয় দলের সঙ্গে নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক বা অন্য কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের সাথীরূপেও না। গিয়েছিলাম 'অপাংক্তেয় খেলা' কবাডির প্রথম আন্তর্জাতিক টেষ্ট সিরিজ কভার করতে। অভিভূত হয়েছিলাম আমি ও সঙ্গী খেলোয়াড় এবং সকলেই ওঁদের আতিথেওতায়, আচরণে ও প্রাণঢালা ভালবাসায়। গত ক'বছরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নানাভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে, বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ়তর করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দুই দেশের সাধারণ মানুষের খেলা কবাডি বোধ হয় সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে।

এই গ্রন্থে তারই কিছু নজির তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

চিরঞ্জীব

এই লেখকের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

খেলাধূলার নেপথ্যে

জয় থেকে জয় ক্রিকেটে (২য় সংস্করণ)

খেলাধূলার আধুনিক নিয়ম কানুন (৪র্থ সংস্করণ

সেরা সেরা খেলোয়াড়

ক'নোজি আংরে (২য় মুদ্রণ)

ক্লে—ক্যাসিয়াস ক্লে

ফুটবলের তিন রাজা

খেলার মাঠের অন্তরালে

স্পোর্টস ডায়েরী

নেপথ্যে
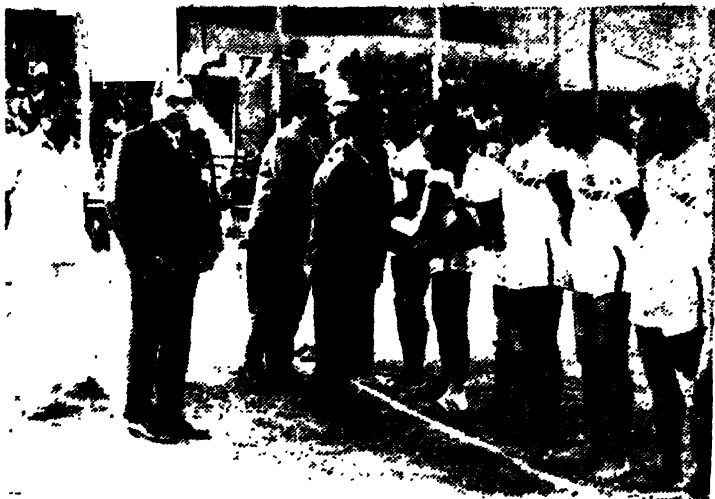
আসানসোলে জাতীয় কবাডি প্রতিযোগিতার
সময় পশ্চিমবঙ্গ দলের সঙ্গে করমর্দন করছেন বাংলা
দেশের কাজি আনিসুর রহমান ও
এম এ হামজা।

বাংলাদেশ অভিমুখে দমদম বিমানঘাটিতে ভারতীয় খেলোয়াড়
ও কর্মকর্তাগণ।

তেজগাঁও বিমানঘাটিতে ভারতীয় কবাডি দল।

ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলার আগে ভারতের
এজাজুল্লা গৌরীর সঙ্গে করমর্দন
করছেন তাজুদ্দীন আমেদ।

ঢাকা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দল।

ঢাকা স্টেডিয়ামে দুই দেশের খেলোয়াড়দের
মধ্যে প্রীতি বিনিময়।

জাহাঙ্গীর আলম হানা দিচ্ছে ভারতীয় কোর্টে।

ফরিদপুরে খেলার আগে দুই দেশের ম্যানেজার।

যশোহর বিমানঘাটিতে ভারতীয় দলের বিপুল সংবর্ধনা

ফরিদপুরে ভারতীয় কোর্টে বাংলাদেশের হানাদার।

কুমিল্লা স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের
সঙ্গে বাংলাদেশের কর্মকর্তাগণ।

টাঙ্গাইলে ভারতীয় হানাদার ধরা পড়েছে।

রংপুরে দুই দেশের ম্যানেজার পতাকা ও
মালা বিনিময় করছেন।

ছবিগুলি বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ
কবাডি অ্যাসোসিয়েশন, নিখিল ভট্টাচার্য ও
মনোজিৎ চন্দের সৌজন্যে।

৯ই ফেব্রুয়ারি। ১৯৫৪। বিকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে দমদম থেকে টেক অফ-এর আগে স্পিকারে বাংলায় ভেসে এল—"আসলাম আলাইকম, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ বাংলাদেশ বিমানের ক্যাপ্টেন সাজাহানের পক্ষ থেকে বলছি। আমরা ১১ হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হচ্ছি। আশা করছি ৫০ মিনিটের মধ্যে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাব। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। ধন্যবাদ।"

অতঃপর ওই কথাগুলোর ইংরাজী তর্জমা শোনা গেল। কিন্তু বিমানে প্রথমেই বাংলা ঘোষণা অনেককে অবাক করল। বিশেষতঃ আমাদের সঙ্গী ভারতীয় অবাঙালীদের। ওদের স্মরণ করিয়ে বললাম —উই আর গোয়িং টু বাংলাদেশ।

আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। বাঙালী বলে গর্ববোধ করছিলাম। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও বাংলা 'স্থানীয়' রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু তা আজও কার্যকর হয়নি। দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষায় স্থান নেই। বুঝলাম বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখের আশাকে বাংলাদেশই রূপান্তরিত করেছে। ওঁরা মর্যাদা দিয়েছেন বরকত—জামালের বুকের রুধিরকে, মূর্ত করেছে তাদের মুখের ভাষাকে। ধীক্কার জানাতে ইচ্ছে করছিল এপার বাংলাকে। ভাবলাম ককপিটে গিয়ে ক্যাপ্টেন সাজাহানকে বলে আসি— সাজাহান ভাই। আমরা পারিনি, তোমাদের হাজারো সেলাম, লাখো সেলাম। কথাগুলো বলি আরো চীৎকার করে এবং তা ইথারে ইথারে ভেসে যাক।

আমার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালেন বিমান সেবক।

—কফি-জলখাবার খাবেন তো !

—নিশ্চয় ! কিন্তু তার আগে বাংলাদেশের খবরের কাগজ দিন না, যদি থাকে। কয়েকখানা কাগজ খুলতেই দেখি ভারতীয় কবাডি দলের ঢাকায় পৌঁছবার খবর বড় বড় শিরোনামায় ছাপা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয় দলের সফর সূচীরও।

এবার অন্য ভাবনা মাথায় এল। আমি ফিরে গেলাম পিছনে।

সম্ভবত ১৯৫৩-এর ডিসেম্বর। আসানসোলে চুয়াত্তরের জানুয়ারীতে জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা হবে—এই কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কবাডি সংস্থার তাঁবুতে এই নিয়ে নানা আলেচনা, তোড়জোড়, এরই মাঝে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ফিরলেন ভারতীয় কবাডি সংস্থার কোষাধ্যক্ষ অচিন্ত্য কুমার সাহা। কথায় কথায় আমাকে বললেন, বাংলাদেশে ভারতীয় কবাডি দলের সফরের সময় আপনাকেও যেতে হতে পারে। বাংলাদেশ একজন সাংবাদিককে চায় এবং আপনাকেই।

সত্যি বলতে কী—আমি ওঁর কথায় একদম গুরুত্ব দিইনি। বললাম, দেখা যাক। অফিসিয়ালি আমন্ত্রণ আসুক !

২৭ জানুয়ারি আসানসোলে জাতীয় কবাডি শুরু হবে। তার প্রস্তুতি দেখতে ২৩ তারিখে একবার ওখানে গেলাম। অচিন্ত্যবাবুর আবার জিজ্ঞাসা—কী দাদা, বাংলাদেশে যাচ্ছেন তো !

আমার পুনরায় একই বক্তব্য—চিঠি আসুক !

২৬ জানুয়ারি দুপুরে তল্পিতল্পা নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য আসানসোলে হাজির হলাম। ২৭ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী জাতীয় প্রতিযোগিতার মাঝে বাংলাদেশের দুই প্রতিনিধি আসানসোলে এলেন। একজন—বাংলাদেশ ক্রীড়ানিয়ন্ত্রণ সংস্থার আহ্বায়ক কাজী আনিসুর রহমান। অপর ব্যক্তি—বাংলাদেশ কবাডি সংস্থার সম্পাদক এম এ হামজা। এঁদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল। বললাম, বাংলাদেশে আমার জন্ম। যেতে পারলে সৌভাগ্যবান মনে করব।

ওঁরাও বললেন, আইস্যা পড়েন, আর দোনামোনা কইরেন না।

আমার কিন্তু তখনও গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল অবস্থা। জানুয়ারি শেষ হতে চলেছে, পাশপোর্ট নেই, ভিসাও না।

২রা ফেব্রুয়ারির আগে আসানসোল থেকে কলকাতায় ফিরতেও পারছি না। ওদিকে ভারতীয় দল ঢাকা যাবে ৯ তারিখে। তদুপরি কোনো সরকারী আমন্ত্রণ আমার হাতে আসেনি। ভারতীয় কবাডি সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রাজা গোপালাচারী বললেন, প্রথম কবাডি টেস্ট সিরিজে আমাদের দেশ থেকে একজন সাংবাদিক যাওয়া উচিত। যিনি যাবেন, তিনি এই ঐতিহাসিক সফরের সাক্ষ্য বহন করবেন। আপনারা তো ফুটবল, ক্রিকেট কভার করেন। একবার না হয় সময় নষ্ট করে কবাডিতেই গেলেন।

প্রশ্নটা আমাদের ক্রীড়া সম্পাদক মতি নন্দীর কাছে তুললাম। তিনি বললেন, চিঠি পত্তর আসুক।

জাতীয় কবাডি শেষে ২ ফেব্রুয়ারি সকালের ট্রেনে আসানসোল থেকে কলকাতায় ফেরার পথে রাজা গোপালাচারী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আর ইউ গোয়িং টু বাংলাদেশ? আমি—নট ইয়েট ডিসাইডেড। অ্যাণ্ড হেয়ার ইজ দ্য ইনভিটেশন লেটার?

৩ তারিখে অফিসে গিয়েই চিঠি পেলাম। একখানি চিঠি এসেছিল আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের নামেও।

৪ তারিখে পাসপোর্টের দরখাস্ত পূরণ করে দাখিলের পর শোনা গেল—অসম্ভব, ১০ তারিখের আগে পাশপোর্ট পাওয়া যাবে না। আমরা বললাম, মশাই ৯ তারিখের মধ্যে ঢাকা পৌঁছুতেই হবে। ১০ তারিখে ওখানে প্রথম টেষ্ট। বাংলাদেশ সরকার সমস্ত প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। বাংলাদেশ বিমানকেও বলে রাখা হয়েছে, ৯ তারিখ লাষ্ট ফ্লাইটে আমরা ঢাকা যাবো। যে ভাবেই হোক ৮ তারিখের মধ্যে পাশপোর্ট চাই। দুপুরে পেলে বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিস এক ঘণ্টার মধ্যেই ভিসার ব্যবস্থা করে দেবেন। তারা

বলেছেন, আমাদের দিক থেকে কোনো অসুবিধে হবে না, আপনারা পাশপোর্ট বের করুন।

৬ তারিখেও পাশপোর্ট অফিস থেকে স্বস্তির বাণী শোনা গেল না। শুধু বললেন, লোকজন কম, তবুও ৮ তারিখ দুপুরে আসুন। সেদিন অবশ্য নিরাশ করেননি ওঁরা। পাশপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ হাই কমিশনের কর্মীরা ভিসা দিয়ে দিলেন। সন্ধ্যেবেলায় নিশ্চিন্ত হলাম—৯ তারিখ আমরা ঢাকা যাচ্ছি।

কিন্তু সমস্যায় পড়লাম টাকার ব্যাপারে। কুড়ি টাকার বেশি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তা হলে আড়াই সপ্তাহ চলবে কেমন করে? বাংলাদেশ সরকার খাওয়া, থাকার বন্দোবস্ত করলেও আমাকে নিত্য কলকাতায় খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়াও টাকার প্রয়োজন হতে পারে। মুশকিল আসান করলেন বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী। আমাদের ঢাকা অফিসের ভার-প্রাপ্ত তুষার পণ্ডিতকে টেলেক্সে জানিয়ে দিলেন—'চিরঞ্জীব ভারতীয় কবাডি দলের সঙ্গে যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে ওকে সাহায্য করো।'

এবার ককপিটের দিকে তাকাতেই দেখি বাঁদিকে লাইট জ্বলে উঠেছে—সীট বেল্ট বাঁধুন। মুহূর্ত মধ্যে সেই কণ্ঠস্বর আবার—ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তেজগাঁও বিমান বন্দরে নামবো। আপনার আসন বন্ধনী বেঁধে নিন। ধন্যবাদ।

জানালা দিয়ে চোখ গেল নিচের দিকে। আলোয় আলোময় শহর। হ্যাঁ, এটাই ঢাকা। ১৯৫১ এর ১৭ ডিসেম্বরের আগে যে ঢাকা আমার স্বপ্ন ছিল। কোনোদিন ভাবিই নি ঢাকা আসতে পারবো। একাত্তরের ৭ মার্চ রমণা রেস কোর্সে শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা। সেদিন রেডিও মারফৎ যে কথাগুলি শিহরণ জাগিয়েছিল—এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।···তোমাদের যার যা আছে তাই

নিয়া প্রস্তুত হও।······ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো···।

তারপর মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য। যুদ্ধের অন্তিম পর্বে ভারতীয় বাহিনীর অধ্যক্ষ শ্যাম ম্যানেকশ'র পক্ষ থেকে আকাশবানী মারফৎ প্রচার—হাতিয়ার ডাল্ দেও···। এবং ১৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর নিয়াজির আত্মসমর্পণ। নানা ঘটনা উঁকি দিচ্ছিল।

৬টা ৫০ মিনিটে আমাদের বিমান তেজগাঁওয়ের রানওয়ে স্পর্শ করল।

বিমানটি রানওয়ে ঘুরে যখন তেজগাঁও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে দাঁড়াল, জানালা দিয়ে তাকাতেই অসংখ্য মুখ চোখে পড়ল। কারুর হাতে ক্যামেরা, বুঝলাম ওরা আমার সমগোত্রীয়—সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি। কারুর কারুর হাতে ফুলের মালা। এছাড়াও অসংখ্য মানুষ। মালা নেই, তোড়া নেই। ওরা হাত তুলে দাঁড়িয়ে—ভারতীয় কবাডি দলকে স্বাগত জানাতে এসেছেন।

প্রথমে নামলেন শেফ-দ্য-মিশন—এস এন সালভি, তারপর ম্যানেজার—অচিন্ত্য সাহা, অতঃপর কোচ—পি, কে ওয়ালঞ্জ এবং একে একে খেলোয়াড়রা—অধিনায়ক শেখর শেঠি, সহ অধিনায়ক এম সুভান্না, বসন্ত সুদ, এম এস বিচারে, জয়দেব সাঁতরা, মহম্মদ এজাজল্লা গৌরি, শেখর পাতিল, এ ভি কোটেশ্বর রাও, জি বিজয় দাস, এ বিশ্বনাথন ও নিশাকর চক্রবর্তী এবং অবশেষে এই অধম সাংবাদিক। আমরা যেখানে নামলাম—বিমানবন্দরের সার্চলাইট পৌঁছলেও তেমন আলোকিত ছিল না। তবুও নিরাপত্তার বাঁধন ভেঙে অসংখ্য তরুণ এসে সকলের গলায় মালা পরাতে লাগল। আমি অভ্যর্থনা লক্ষ্য করছিলাম। ইতিমধ্যে আমিও অভ্যর্থনার শিকার হলাম। সেই তরুণরা প্রশ্ন করার অবকাশ দিল না। 'খেলোয়াড় না হোন, বন্ধু রাষ্ট্রের লোক তো!'

লাউঞ্জে পৌঁছবার আগেই বিশিষ্টদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আসানসোলে আসা সেই কাজী আনিসুর রহমান, এম এ হামজার সঙ্গে

দেখা হতেই বললাম বাঙাল ভাষায়—আইস্যা গেছি। কথা রাখছি।

রসিক হামজাভাই বললেন, না আইস্যা পারেন মশাই, প্রাণের টানডা যাইবে কই। সবই শুনছি। আপনি বাংলাদেশের লোক খুলনোয় জন্ম।

আমার কাছাকাছি হাঁটছিলেন সাড়ে ছয় ফুট উচ্চতার, বেশ স্বাস্থ্যবান স্যুটেড বুটেড এক ভদ্রলোক। শুধোলেন—আপনি খুলনার লোক? হাত বাড়ালেন করমর্দনের জন্য। তিনি বললেন, আমি আপনার পার্শ্বের জিলার যশোরের।

—নামটা বলুন এবার'

—সৈয়দ শাহীদুল ইসলাম।

—খেলাধূলার সঙ্গে জড়িত নিশ্চয়ই।

বিনীত ভাবে বললেন—সামান্য সামান্য। আমাদের সিনেমা স্টার শত্রুঘ্ন সিংহের চেহারার এক তরুণ ফিস ফিস করে জানালেন—ইনি বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনসের ডিরেক্টর এবং অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সম্পাদক।

লাউঞ্জে ঢুকতেই দেখা হল ওপার বাংলার সতীর্থ সাংবাদিকদের সঙ্গে। পরিচয় করাতেই শেফ দ্য মিশন, ম্যানেজার, কোচ, ক্যাপ্টেন প্রভৃতির কাছে ওরা নানা তথ্য জানলেন।

আমি অপেক্ষা করছিলাম কাস্টমসের লোকদের জন্য। চাবি হাতে নিয়ে—কখন স্যুটকেশ খুলতে হয়! পাশপোর্ট এন্ট্রি করিয়ে আনলেন বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সদস্যরা। লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে বিমানের বাসে উঠলাম শহরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কাস্টমসের দ্বারস্থ হতে হলো না। বাংলাদেশ কবাডি দলের ম্যানেজার আবুল হাসানাত বললেন—বন্ধু রাষ্ট্রের লোকদের আবার কাস্টমস চেকিং? কি যে কন্।

দমদমে কিন্তু আমাদের অন্য ভয় ছিল। আমাদের পররাষ্ট্র দফতর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের জন্য বিরাট বিরাট প্যাকেট

দিয়েছিলেন ম্যানেজার অচিন্ত্যবাবুর জিম্মায়। ওদিকে তাঁর সঙ্গেও বড় বড় প্যাকেট ছিল ; কবাডির বই পত্তর, ব্যাজ, পতাকা ইত্যাদি। বাংলাদেশ বিমানের এক অফিসার বলেছিলেন—প্লেনে ধরলে হয় !

বাস এগিয়ে চলেছে শহরের দিকে। ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক। মাঝে ছোট ছোট লম্বা আইল্যাণ্ড। অনেকটা দিল্লীর মত। প্রাইভেট কার, অটো রিক্সা, রিক্সা, বাস প্রচুর। কিন্তু পথচারী কম। ভারতীয় সময় সাতটা এবং বাংলাদেশ সময় সাড়ে সাতটা হলেও পথচারী বেশ কম। আমাদের অভিভাবক বছর ত্রিশ বয়সের জামিল বললেন, "মশাই এটা কলকাতা নয়। অফিস টাইমের পর আর লোকজন বড় দেখা যায় না।" কিন্তু রাস্তাঘাট বেশ পরিস্কার। কলকাতার মত রাস্তার ধারে ধারে অস্থায়ী দোকান বা ফেরিওয়ালা নেই। ট্রাফিক জ্যাম নেই। বেশ দ্রুত চলছিল বাস। সেই বিখ্যাত ইণ্টার কন্টিনেণ্টাল হোটেল ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই হঠাৎ ডানদিকে চোখ পড়ল আমাদের রাইটার্স বিল্ডিংসের মত লম্বা বাড়ি। জামিল জানালেন—এটি বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট। বাঁদিকে দেখলাম বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস।

বাস থামল বাংলাদেশ বিমানের সদর কার্যালয়ের সামনে। জামিল ওই অফিসেরই কর্মী। প্রায় বিপরীত দিকে 'পূর্বরাগ' হোটেল দেখিয়ে বললেন—আপাতত সকলকেই ওখানে যেতে হবে।

খেলোয়াড়দের ওখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। স্থির হল কোচও থাকবেন খেলোয়াড়দের সঙ্গেই। সর্বত্র নিয়মও তাই। সব ঠিক থাকলেও বিধি অনুযায়ী হোটেলের রেজেষ্ট্রি খাতায় নাম, ধাম লেখা, কে কোন রুমে থাকবেন ইত্যাদি শেষ করতে সময় লাগছিল।

জামিল বললেন, একটু বিশ্রাম করুন। আপনার থাকার ব্যবস্থা অন্য হোটেলে। আমি তখন 'পূর্বানী' হোটেলের খোঁজ করছি।

ওখানেই আনন্দ বাজার পত্রিকার অফিস। বললাম, এখনই আমাকে ওখানে যেতে হবে। কলকাতায় খবর পাঠানো দরকার। এবার অভিভাবক হলেন ঢাকার সেই শত্রুঘ্ন সিংহ ওরফে জাহীতুল। একটা বাড়ি পেরিয়েই 'পূর্বানী'।

নবম তলায় ৮৩৮ নম্বর ঘরে টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল।

—তুষারবাবু আছেন ?

—না, আপনি কলকাতা থেকে আসছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—উনি আপনার কথা বলছিলেন। এখনই আসবেন।

বুঝলাম উনিও আনন্দবাজারের কর্মী। নাম জলিলুদ্দীন।

টেলেক্স অপারেটর।

ভেবেছিলাম তুষার পণ্ডিত ঢাকায় গিয়ে বাউণ্ডেলেপনা ছেড়েছে। কলকাতার মত ভবঘুরে নয়। কিন্তু এক লহমায় আমার সে ভাবনা বিলীন হল অফিস ঘরে সব জিনিসপত্র ছড়ানো দেখে। কলকাতার ডেসপ্যাচ পাঠাবার পরমুহূর্তে সে এল।

—কি রে 'রিপোর্টার কলঙ্ক' কখন এলি ? কলকাতায় তুষার আমাকে ওই নামেই ডাকতো। আমরা ওকে বলতাম—মিস্টার বানাও, কী খবর বানাচ্ছো ? কলকাতায় থাকাকালে সে নিত্য নতুন দারুণ দারুণ স্কুপ খবর লিখত। সেই তুষার শুধোল—কলকাতার জন্য কিছু বানালি ? আমি বললাম—লাইন পনের পাঠালাম—অ্যারাইভাল নিউজ। আর রিভাইজড্ প্রোগ্রাম ইণ্ডিয়া-বাংলাদেশ কবাডি টেষ্টের।

এবার সে সিগারেটে লম্বা টান মারতে মারতে অফিসের লাগোয়া ওর বেড রুমে টেনে নিয়ে গেল।

—বস্ কিছু খাওয়া যাক। কলকাতা থেকে কখন খেয়ে বেরিয়েছিস ?

—বেলা একটায়।

—তবে তো হেভি কিছু খাওয়া দরকার।

দার্জিলিং-এর ছেলে তুষার বাঙাল ভাষায় বেয়ারাকে বলল, এই নে টাকা। সেই যে রাস্তার থেইকা আনো। চিকেন রোষ্ট আর মটন কোপ্তা। ভাল কইরা ভাইজ্যা আনবি। পোরা পোরা কইর‍্যা, বুঝলা তো। আর তারাতারি আইবা।

তুষারের ছোকরাটি সাড়ে আটটায় বেরিয়ে এত তাড়াতাড়ি এল যে সাড়ে দশটা বাজল। খেতে খেতে সওয়া এগারটা হল। পেট পুরে খাওয়ার পর তুষার জিজ্ঞাসা করল—তোর তো ডিনার বাকি। মনে মনে ভাবলাম—এর পরেও ডিনার? আবার মনে হল ঢাকাই নিয়ম কী কে জানে? তাই বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু এত রাত্রে ডিনার পাওয়া যাবে তো?

—কি যে বলিস! এটা পূর্বানী। সারা রাত খাবার পাবি। ভারতীয় দলের ম্যানেজার অচিন্ত্যবাবু আর শেফ দ্য মিশন মিস্টার সালভিকে ডেকে নিয়ে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ডাইনিং হলে গেলাম। সেখানে মেনু দেখে ও বয়কে জিজ্ঞাসা করে ওদের দুজনের চক্ষু চড়কগাছ। স্যাণ্ড উইচ আর আইসক্রিম ছাড়া কিছু নেই। অথচ ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সালভি আমাকে এক চোট নিল—তুমি তো বন্ধুর সঙ্গে পেট ভরিয়েছ, আমাদের অবস্থা ভাবলে না। রাত বারোটায় কিছু পাওয়া যাবে না।

তুষার স্বভাবসিদ্ধ ভাবে বলল, মত্ ঘাবড়াইয়ে, দিস ইজ পূর্বানী। আমাকে জানাল, রুমে গিয়ে টেলিফোনে রুম সার্ভিসকে ডেকে যা খুশি অর্ডার দিলেই খাবার পাবি। কী খেতে চাস—ষাঁড়ের ঝুটির ডালনা, হাতীর দাঁতের সুপ, বাঘের চোখের চপ? সব পাবি।

সালভি তাড়াতাড়ি বললেন, নেহী—নেহী আই অ্যাম এ ভেজিটেরিয়ান।

—সরি, দেন নো প্রবলেম।

তুষারকে বললাম, তুই কিছু খাবি না?

—না, শুধু কফি হলেই চলবে।

আমরা ঘরে ফেরার আগে তুষার ডাইনিং হলেই আলাপ করিয়ে দিল মিস মাফিটের সঙ্গে। প্রথমে ওর নামটা শুনে খুব কৌতুহল হয়েছিল। একে মেমসায়েব, তদুপরি মিস। যাক্ ঢাকায় বেশ কাটবে। একবার মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই তুষারের গার্ল ফ্রেণ্ড। কিন্তু আলাপ হতেই সব আশা, সব ভরসা কর্পূরের মত উবে গেল। বয়স পঞ্চাশের কোঠায় পড়ি পড়ি। কলকাতার পার্কসার্কাসের বাসিন্দা। সম্প্রতি ঢাকায় চাকরি নিয়ে গিয়েছেন। পূর্বানীর হাউস-কিপার তিনি। তুষার পরিচয় করিয়ে দিল—এখানে ইনি আমার অভিভাবিকা। তোর কোনো প্রয়োজন হলে এর কাছে বলবি। ৫৩৯ নম্বরে ফোন করলেই পাবি। আমার অনুপস্থিতিতে ঘরের চাবিও পাবি।

আমরা ঘরে ফিরে রুম সার্ভিসকে ডেকে ডিনারের অর্ডার দিলাম। কিন্তু যা এল তা আকণ্ঠ খেয়েও আরও দুই-তিন জনের মত রয়ে গেল। শুতে শুতে রাজল একটা।

১০ ফেব্রুয়ারী

সাড়ে ছটায় টেলিফোন তুলতেই সাড়া পেলাম—সুপ্রভাত। পাল্টা আমার 'গুডমর্নিং' বেরিয়ে গেল। বাঙালী হলেও অভ্যস্ত নই যে! তাই সংশোধন অর্থাৎ 'সরি সুপ্রভাত' বলতে হল।

—আচ্ছা আমি সব খবরের কাগজ চাই। কোথায় কাকে বলব ?

—আপনি দরজা খুলে দেখুন, দরজার সামনেই কাগজ পৌঁছে গেছে। তবে তা শুধু 'বাংলাদেশ অবজার্ভার'।

—না, আজকের সব কাগজ চাই।

—অনুগ্রহ করে ধরুন। রিশেপশানে দিচ্ছি। ওদের বলুন। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রিসেপশানের নির্দেশে হকার এল ঢাকার বিভিন্ন কাগজ নিয়ে। দেখলাম সব কাগজেই চমৎকার কভারেজ হয়েছে গত সন্ধ্যায় ভারতীয় দলের ঢাকা আগমন সম্পর্কে। তবে সবার উপরে 'বাংলার বাণী' ও 'দৈনিক বাংলা'। বাংলার বাণী-তে ভারতীয় দলের প্রত্যেকের ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় বেরিয়েছে। 'দৈনিক বাংলা'য় বিমান বন্দরে অবতরণের ছবি এবং প্রথম টেষ্টের প্রাক বিবরণ ৬০ পয়েণ্ট অক্ষরে চার কলম হেডিংএ। কিন্তু সবচেয়ে নিরাশ হলাম আমার প্রিয় 'ইত্তেফাক' দেখে। ইত্তেফাকে খেলার খবর সাকুল্যে এক কলমও থাকে না। তাও আবার সব খেলা মিলিয়ে। 'ইত্তেফাক' আমার প্রিয়—কারণ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত আমি ওই কাগজে নিয়মিত লিখতাম। প্রতি সপ্তাহে 'কলকাতার চিঠি' কলমটিও লেখক ছিল এই অধম। পরলোকগত তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা) প্রতিষ্ঠিত এই দৈনিকটি পাকিস্তানী আমলে 'নিষিদ্ধ' ঘোষিত হয়েছে বারংবার। কিন্তু ইত্তেফাক কখনও মাথানত করেনি। নানা কারণে ভারতে যেমন সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকা, তেমনি বাংলাদেশে ইত্তেফাক।

অধিকাংশ পত্রিকাই অফসেটে ছাপা হলেও ঢাকায় প্রথম দিনে দৃষ্টি কেড়ে নিল 'দৈনিক বাংলা'। হুবহু আনন্দবাজারের মত লাডলো টাইপ। অবাক হতে হয় কাগজের সংখ্যা দেখে। ইত্তেফাক, বাংলার বাণী, দৈনিক বাংলা ছাড়াও আছে সংবাদ, পূর্বদেশ, আজাদ, জনপদ। ইংরাজি—বাংলাদেশ অবজার্ভার, মর্নিং নিউজ, পিপ্‌ল। খেলার খবর বেশি থাকে ইংরাজি কাগজেই। পিপ্‌ল তো আকছারই হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে প্রবন্ধ ও খবর লিফট করে। একদিন দেখলাম তারা অরিজিত সেনের কবাডির প্রবন্ধ আর জেনিফার পেজএর—উইমেন ইন স্পোর্ট হুবহু তুলে দিয়েছে। প্রতিটি কাগজে রবিবারে বিশেষ ক্রোড়পত্র বের হয়। এবং অধিকাংশ রচনাই সাহিত্য বিষয়ক। কোনো কোনো কাগজ আবার আমাদের প্রতি মঙ্গলবারে 'মাঠ

ময়দান' খেলার পাতার মত বুধবারে খেলার পৃথক ফিচার বের করে। শুনলাম, একাজে বাংলাদেশে অগ্রণী ইত্তেফাক।

তবুও কোনো কাগজ খেলাধূলার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয় বলে মনে হল না। অধিকাংশ কাগজেই খেলার দায়িত্ব এক বা সর্বাধিক দুজনের উপর। আবার তাদের অধিকাংশই আংশিক কর্মী। বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে দিনের পর দিন খেলাধূলার প্রসার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তাদের কথায় বোঝা গেল—সংবাদপত্রের পরিচালকমণ্ডলী রাজনীতিকেই প্রাধান্য দেন। আমি বললাম, তেমন খবর হলে আমাদের খেলা প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পায়। তাছাড়া অরণ্যদেবের পরেই সম্ভবত খেলার খবরই পাঠকদের বেশি টেনে নিয়ে যায়। বললাম, আপনারাও সমীক্ষা করুন দেখবেন—সব বয়সের লোক খেলা পড়ছেন।

ওঁদের কাছেই জানলাম, রাত আটটার মধ্যে নাকি কপি প্রেসে দিতে হয়। কারুর কারুর শেষ কপিই আটটায় যায়। ভাবছিলাম আহা, ওখানে যদি চাকরি পেতাম। কেননা কলকাতায় আমরা রাত আড়াইটাতেও কপি পাঠাই। একদিন মনে আছে ফিশার-স্প্যাসকির দাবা লড়াইয়ের খবর তিনটে কুড়িতে পাঠিয়েছিলাম। আর সাধারণ নির্বাচনের খবর তো ভোর সাড়ে চারটায় দিলেও ছাপা হয়।

বাংলাদেশের কাগজের শেষ কপি পাঠাবার সময় কলকাতার সতীর্থদের জানাতেই বলল : তুমি ভাই এই একটি ভাল খবর এনেছ। এবার ইউনিয়নকে প্রস্তাব দাও তো ওটি চালু করা যায় কিনা। তাহলে রাত আটটার পর অফিসে থাকতে হবে না, জীবনে নাইট ডিউটি করতে হবে না।

ব্রেক ফাস্টের আগেই এম এ হামজা এলেন

—কী মশাই নাস্তা টাস্তা সারছেন।

—এই তো মাত্র চা খাইলাম, বললেন অচিন্ত্যবাবু।

—মারছেন, মশাই মারছেন। আনিস ভাই (আনিসুর রহমান) প্রোগ্রাম জানায় নাই?

—হ, বললাম আমি। হে তো আপনাগো লাইগা। আমার কাম বিকালে খেলার সময়, আর তারপরে।

—অই হইল। নয়টার মইধ্যে স্টেডিয়ামে গিয়া মাঠ দেখা, রেফারি আম্পায়ারগো রুল বোঝানো।

—ওসব ম্যানেজার আর সালভি বুঝবো।

—আপনি চলেন, মাঠ দেইখ্যা ফ্লাওয়ার শোতে যামু। ওরা দাওয়াদ দিছে।

আমি খুলনার ভাষায় শুরু করলাম,—একটুখানি দাঁড়ান, চ্যান করে নেই। তারপর জাবানে।

ব্রেকফাস্ট সেরে অচিন্ত্যবাবু আর সালভি চললেন জনাব হামজার সঙ্গে স্টেডিয়ামের দিকে। আমি গেলাম একটু পরে। মাঠের ভিতর আমাদের ম্যানেজার ও শেফ দ্য মিশন বাংলাদেশের কবাডি রেফারি ও আম্পায়ারদের আধুনিক নিয়মকানুন বোঝাচ্ছিলেন। স্থির হল, যেহেতু ওঁরা আধুনিক নিয়মকানুনে রপ্ত নন, তাই তাদের সব সিদ্ধান্তই ভারতীয় দল মেনে নেবে। ভুল সিদ্ধান্ত হলেও ক্ষতি নেই।

আমি একবার গোটা স্টেডিয়ামটা ঘুরে নিলাম। শুনলাম ষাট হাজার দর্শক বসতে পারেন বেশ ভালভাবেই। জোর জবরদস্তি করে আরও দশ বা পনের হাজার দর্শক সংকুলানও করা যায়।

স্টেডিয়ামের গ্যালারিগুলির শীর্ষে একদিকে প্রেস গ্যালারি, রেডিওর জন্য কমেণ্টেটার্স বক্স। একদিকে ভি আই পি গ্যালারী। তার উপরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন খেলার জাতীয় সংস্থাগুলির অফিস পাশাপাশি। রয়েছে সব খেলার নিয়ামক বাংলাদেশ ক্রীড়ানিয়ন্ত্রণ

সংস্থারও কার্যালয়। একেবারে উপরের তলায় বিরাট হল। সেখানে নানা সভাসমিতি হতে পারে। ঢাকার এই স্টেডিয়ামে বড় বড় খেলার আসর বসে। হকি, ক্রিকেট, ফুটবল সব কিছু এখানেই হয়। পাকিস্তানী আমলে টেষ্ট ক্রিকেট হয়েছে। আধুনিক স্টেডিয়াম বলতে যা বোঝা যায়, এটিও তাই। আমি ভাবছিলাম কলকাতার কথা আমাদের রবীন্দ্র সরোবরের ধারে যেটি তাতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ খেলা হয় না, আকারেও ছোট। আর ইডেনে যেটি আছে সেটি স্টেডিয়াম নয়। রনজি স্ট্যাণ্ড এবং সারা মাঠের চতুর্দিকে শুধু পাকা গ্যালারি। ইচ্ছে করছিল কলকাতার ক্রীড়া কর্তাদের ডেকে বলি—আপনারা দেখে যান অন্ততঃ একটি বিষয়ে আপনাদের অপেক্ষা ছোট শহর ঢাকা আপনাদের টেক্কা দিয়েছে।

সকালেই গোটা স্টেডিয়ামটিকে সাজানো হচ্ছিল দুই দেশের জাতীয় পতাকায়। কাগজে ছাপানো পতাকা দড়িতে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে গোটা স্টেডিয়াম সাজানো হল। মাঠের ভিতরে দেখলাম ওরা কবাডি কোর্টও তৈরী করেছেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ফুটবল রেফারি জেড এ আলম বললেন, ঢাকা স্টেডিয়ামে এই প্রথম কবাডি খেলা হবে এবং শুরুটা প্রথম আন্তর্জাতিক কবাডি টেষ্ট দিয়ে। আমি বললাম, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামময় ভারত ও বাংলাদেশের নিজস্ব খেলা এটি। ঢাকা স্টেডিয়াম নানান খেলার সাক্ষ্য বহন করলেও স্বদেশী খেলা দেখেনি। এতদিন পরে তার অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হতে চলেছে।

আলমের অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবী পরে বাষট্টি বছরের মধুসূদন দাস সরকার। তিনিও বাংলাদেশের কবাডি আম্পায়ার। এগিয়ে এসে টাক মাথার চশমা পরা মধুসূদন বাবু পরিচয় দিলেন। "আমি ঢাকার লোক। প্রাক্তন কবাডি খেলোয়াড়।

১৯৩৪ সালে ক্যালকাটা খো-খো হাডুডু দলে ছিলাম। আহিরীটোলায় বি কে পাল চ্যালেঞ্জ শীল্ডে খেলেছি। ১৯৩৮ সালে টালা পার্কে যে ভারতীয় ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে বাংলা দলে ছিলাম। বাংলার অধিনায়ক তখন হীরেন সেন (বড় মনু)। ১৯৪৫ সালে বিক্রমপুর হাডুডু ক্লাব গঠন করি। ১৯৫১-এ ঢাকায় কবাডি চালু হতেই আমার বিক্রমপুর দল অংশ নিচ্ছে।"

সময় এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ক্রীড়ানিয়ন্ত্রণ সংস্থার বারান্দা থেকে উচ্চৈস্বরে ডাকলেন জনাব হামজা। চীৎকার করে বলছেনঃ ফ্লাওয়ার শোতে যাইতে হইবো না। সাড়ে দশটা বাইজা গেল। বাংলাদেশে আইসা এবং নিজে বাঙালী বইলা কি বাঙালীর টাইম চালাইবেন? কাছে গিয়ে বললাম, আমার ঘড়িতে তো দশটা। থোন্ থোন্ মশাই, আধ ঘণ্টা আগাইয়া লন। আমাগো ছ্যাশে আমাগো মতন চইলেন। এডা কইলকাতা না।

সব শুনে আমি দ্রুত ঘড়ির সময় বদল করে নিয়ে স্টেডিয়ামের অদূরে পুষ্প প্রদর্শনীর নির্দিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে চলেছি। হামজা ভাই কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ রাগ করেন নাই তো! অনেকদিন মিশছি, কিছু মনে কইরেন না। ন্যান পান খান। অই, হইছে। রাগ কমান।

পুষ্প প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড ভিড়। মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। এবং সবাই আপ টু ডেট। এবং বয়স মোটামুটি কমই। কলকাতায় মেয়েদের বেলবটম্, লুঙ্গী, বব হেয়ার দেখে অভ্যস্ত। না ঢাকাও কম্‌তি নয়। গোগো সান গ্লাস, হাইহিল জুতো, কী নেই।

হামজা ভাইয়ের ঠোঁটে কিছু আটকায় না। এবার বললেন, আপনাগো ফ্লাওয়ার শো দেখাইতে আনছি। অন্য কিছুর দিকে তাকাইয়েন না।

ডালিয়া গোলাপ এবং নানা ধরণের মরশুমী ফুল ছিল প্রদর্শনীতে বিদেশিনীদের ভিড়ে ওগুলির শোভা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বলা

বাহুল্য তাদেরও কেউ কেউ ছিলেন পুরস্কার প্রাপ্তদের দলে। ভারতীয় কাবাডি দলকে তারা ফুল দিয়ে সাদর অভ্যর্থনাও জানালেন। চমৎকার লাগল প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের বক্তৃতাগুলি : ফুল কিসে না লাগে ?

বিয়েতে ফুল, ফুলশয্যায় ফুল, ড্রয়িং রুমে ফুল, মালাবদলে ফুল। যত কাঁটাই থাক একটি সংগ্রহ করে প্রেয়সীর খোঁপায় দিতে পারলেই যেন পরম তৃপ্তি। আবার কেউ মারা গেলেও সেখানে ফুলেরই সমাদর।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম জামিলের নির্দেশে।

ম্যানেজার অচিন্ত্যবাবু ও আমি এক ঘরে, পাশের সিঙ্গল রুমে শেফ ত্য মিশন সালভি।

মজাদার লোক এই এস এন সালভি। পঁয়তাল্লিশ পার হয়েছেন। অবিবাহিত। র‍্যাডিকাল হিউম্যানিসট অর্থাৎ এম এন রায়ের শিষ্য। মহারাষ্ট্র সরকারের স্পোর্টস অরগানাইজার। অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট। সবচেয়ে বড় কথা তিনি নিরামিষ ভোজী। কিন্তু সকালে ব্রেকফাষ্টে ওমলেট এবং ডিমেরই ওমলেট খেয়েছেন শুনে অবাক হলাম। কথাটা বলেছিলেন অন্যতম খেলোয়াড় রসরাজ নিশাকর চক্রবর্তী। বললেন, চিরঞ্জীবদা—ওকে লক্ষ্য রাখবেন। আমাদের শেফ ত্য মিশনের খাওয়ার ত্রুটি যেন না হয় আপনি রিপোর্টার লোক, বললে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। উনি সবাইকে বলেছেন ভেজিটেরিয়ান, কিন্তু ডিম খান। বিলিতী জল-পানীরও অভ্যেস আছে। আমি বললাম, এ আর নতুন কথা কি ! কলকাতায় আমার অনেক বন্ধু আছে যারা ইডলি কিংবা দোসা খায় বাড়িতে। মাছ মাংস ওদের কাছে অদ্ভুত। কিন্তু দুপুরে বা সন্ধ্যায় দিব্যি বারে বসে সব কিছু শেষ করে।

সালভি অবশ্য ওদের মত নন। তাঁর নিরামিষ চামচ আমিষে ছোঁয়ানো নিষেধ। দুপুরে আমরা তিনজনের লাঞ্চের অর্ডার দিলাম এক সঙ্গে। সালভি অনুরোধ করলেন—অ্যাই আনন্দ বাজারকা রিপোর্টার, হামকো এগ কারি বোলো।

আমি বললাম, তুম তো ভেজিটেরিয়ান। তাঁর জবাব, হামার পিছু লাগতা হ্যায় কেও!

এক ঘণ্টা বাদে পূর্বানীর রুম সার্ভিস থেকে যখন খাবার এল, অবাক হলাম। তরকারী, ডাল, ভাত, ইত্যাদি এক প্লেট করে বলেছিলাম। সালভির জন্য এল কারি এক প্লেট, আর আমাদের দুই বঙ্গ সন্তানের জন্য মাছ এক প্লেট ও চিকেন এক প্লেট। কিন্তু প্রচণ্ড খিদের মুখেও কিছুই শেষ করতে পারলাম না। ভাত, তরকারী ডাল, সব বেঁচে গেল বেশ কিছু পরিমাণে। সন্দেহ নেই ওগুলো ডাস্টবিনে যাবে। বড় মায়া হচ্ছিল ওই কথা ভেবে। কত লোক দুমুঠো খেতে পাচ্ছেনা, আর এই ভাবে নষ্ট করছি আমরা ফাইভস্টার হোটেলে বসে। বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ভাই তোমরা এত বেশি খাবার দাও কেন? সে জানাল, এটাই তো স্ট্যাণ্ডার্ড। আমরা বললাম, কিন্তু নষ্ট হচ্ছে যে! একজনের খাবার আমরা তিনজনেই খেতে পারছি না। এ কেমন স্ট্যাণ্ডার্ড বাপু? আমরা তো রামায়ণের যুগের লঙ্কার লোক নই! সে এবার বলল, এতেই অনেকে কমপ্লেন করেন—কম হয়েছে বলে। আমরা বললাম, এরপর অর্ডারের সময় কম করে দিতে বলবে। সে জানাল, কিন্তু বিল কম হবে না। আমরা বললাম, তা না হোক, খাবার নষ্ট করবো না।

খাওয়া শেষ হতেই তোড়জোড় শুরু হল স্টেডিয়ামে যাওয়ার। সবচেয়ে ব্যস্ততা ম্যানেজারের। আমার উপর দায়িত্ব বর্তাল প্রেস টেলিভিশন ও রেডিওর লোকদের কবাডি সংক্রান্ত ভারতীয় পুস্তিকাগুলি বিতরণের। ম্যানেজার তখন জাতীয় পতাকা, কবাডি সংস্থার পতাকা, মনোগ্রাম ইত্যাদি গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। আমি

এর মাঝে আনন্দবাজার অফিসে গিয়ে তুষারের স্মরণ নিলাম। একজন ফটোগ্রাফার চাই, প্রথম টেস্টের ছবি পাঠাবো কলকাতায়। তুষারের পরামর্শ, 'খবরদার ও কাজ করিস না। দেড়শ', দুশ' টাকা বিল হয়ে যাবে। বরং আমার ক্যামেরা নিয়ে যা। গোটা চারেক এক্সপোজার বাকি। তুলেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিস, আমি চারটের ফ্লাইটে আজই কলকাতায় যাচ্ছি। কলকাতায় গিয়ে প্রিণ্ট করাবো অফিসের স্টুডিওয়'।

তুষারের পরামর্শ শিরোধার্য করে তার ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে স্টেডিয়ামের দিকে রওনা হলাম। তখন পৌনে তিনটে। রাস্তায় নেমেই কলকাতার দৃশ্য। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের খেলা বা ইডেনে টেস্ট থাকলে যেমন সকলকে ওই দিকে যেতে দেখা যায়, তেমনি ব্যাপার। সকলেই আজ স্টেডিয়ামমুখী।

উদ্যোক্তারা গেটের কাছে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তবুও ভিড় ঠেলে ঢুকতে বেশ বেগ পেতে হল। খেলোয়াড়দের ড্রেসিং রুম ঘুরে স্টেডিয়ামে ঢুকেই চোখে পড়ল দুই দেশের অসংখ্য জাতীয় পতাকা। আর স্টেডিয়াম হাজার হাজার দর্শকে পূর্ণ। কবাডি কোর্টের একধারে বাংলাদেশ বেতার, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ও আলোকচিত্রীরা। প্রেস গ্যালারিতে আবার দেখা 'বাংলার বাণী'র তরুণ সাংবাদিক আব্দুল মাজেদ চৌধুরীর। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন অন্যদের সঙ্গে। 'ইত্তেফাকের' বদিউজ্জামান বললেন, আপনি তো একদা আমাদের কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বললাম, হ্যাঁ যখন তোফাজ্জল হোসেন জীবিত ছিলেন। এবং ১৯৫৫তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে আর লেখার সুযোগ হয়নি। 'তাহলে এবার আবার শুরু করুন!' বললেন তিনি।

মাজেদ নিয়ে গেলেন বাংলাদেশ বেতারের জনাব সাজাহান ও হামিদ-এর কাছে। হামিদ ভাই ঢাকার একটি ইংরাজি দৈনিকের সাংবাদিক। সব খেলার বেতার ভাষ্যকার। তবে ধারাবিবরণী

শুনে মনে হল—সবচেয়ে মজাদার করে বলতে পারেন সাজাহান ভাই।

মাজেদ দেখালেন—ভি আই পি গ্যালারিতে বাংলাদেশের তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এসেছেন। এসেছেন বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও। মন্ত্রীদের মধ্যে দুজনকে চিনলাম। একজন যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দীন আহমেদ। তিনি এখন অর্থমন্ত্রী। বাকিজন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলি। ইউসুফ আলির মত ক্রীড়ানুরাগী লোক ওঁদের ক্যাবিনেটে আর নেই। ষাটের দশকেও তিনি নিয়মিত হাডুডু (কবাডি) খেলেছেন।

কথাছিল বাংলাদেশ সময় সাড়ে তিনটায় খেলা শুরু হবে। কিন্তু ১০ মিনিট দেরী হল ভারতীয় দলের মাঠে আসতে। তারপর পরিচয়ের পালা। পতাকা ও ফুল বিনিময়। দুইদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজলো। এদিনের খেলার উদ্বোধক অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দীনের সঙ্গে দুই দলের খেলোয়াড়ের পরিচয় পর্বের পর তিনি উদ্বোধন প্রসঙ্গে বললেন : দুই বছর আগে যে মহান্ ভারতের সহযোগিতায় আমাদের মুক্তি আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছিল, আজ তাদের সঙ্গে প্রথম কবাডি টেস্ট খেলা হচ্ছে। বলা বাহুল্য আজই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কবাডির যাত্রা শুরু। আর সে যাত্রায় আমাদের সঙ্গী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত। ঢাকা স্টেডিয়াম আজ আর একটি ইতিহাসের স্বাক্ষী হল।

প্রথম টেস্ট

এবার খেলা শুরু। ভারতীয় দলে নামল—শেখর শেঠী, এম সুভান্না, বসন্ত সুদ, এম এস বিচারে, জয়দের সাঁতরা, মহম্মদ এজাজুল্লা, গৌরী ও শেখর পাতিল। বাংলাদেশ দলে—মকবুল হোসেন, মহম্মদ সালেক, রুস্তম আলি, জাহাঙ্গীর আলম, আমির হোসেন পাটোয়ারী, জুলফিকর আলি ও আমুল হোসেন মৃধা। রেফারি—এম এ হামাজা।

আম্পায়ার—জেড এ আলম ও মধুসূদন দাস সরকার।

ধারণা ছিল আধুনিক নিয়মে চোস্ত ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে ঘেঁষবে না বাংলাদেশের ছেলেরা। কিন্তু আরম্ভেই সে ধারণা নস্যাৎ করে দিল জাহাঙ্গীর আলম ভারতের হানাদার ধরে। পরক্ষণেই রুস্তম আলী ধরল আরেকজন হানাদার। অর্থাৎ বাংলাদেশ ২—০ পয়েন্ট এগিয়ে। শুরুতেই তাই স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে প্রবল উত্তেজনা। ঢাকার দর্শকরা বুঝলেন ফুটবল, হকি অপেক্ষা কবাডি কম উত্তেজনার নয়।

এবার ভারতের সহ অধিনায়ক সুভান্না হানা দিয়ে একটি পয়েণ্ট করল। কিন্তু ওদের জাহাঙ্গীর হানাদার ধরে ৩—১ এগিয়ে রইল। ভারতের অধিনায়ক শেখর হানা দিয়ে ৩—২ করল। তারপর বসন্ত ধরে ৩—৩। ছিপছিপে চেহারার কুমিল্লার ২৩ বছর বয়সী জাহাঙ্গীর পর পর দুজনকে ধরে ৫—৩ এগোলো। ভারতের অধিনায়ক এবার স্ট্র্যাটেজী বদলালো। হানাদার ধরে ও হানা দিয়ে সে ৬—৫ এগিয়ে নিল। এবার উপর্যুপরি হানা দিতে থাকল সুভান্না এবং করল ৭—৫, ৮—৫। খেলা চলছে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে। পয়েণ্ট হতে লাগল ৮—৬, ৯—৬, ৯—৭, ১০—৭, ১১—৭। বাবরী চুলের বসন্ত সুদ বাংলাদেশের শেষ জীবিতকে মেরে এল এবং 'লোনা' পেল। ভারত এগিয়ে গেল ১৫—৮ পয়েণ্টে। রেফারির বাঁশি বাজল। ২০ মিনিট খেলা হয়েছে, এখন বিরতি পাঁচ মিনিট।

মাজেদকে বিরক্ত মনে হল বাংলাদেশের কোচ সাহেব আলীর কোর্টের ধার থেকে কোচিং। কবাডিতে নিয়ম নেই কোর্টের ধার থেকে কোনো নির্দেশের। মাজেদ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা, এটাতো বে আইনী। আমি বললাম, তা হোক, ও নিয়ে ভারত আপত্তি করবে না সম্ভবত। কারণ এত কড়াকড়িভাবে নিয়ম এখনই চালু করা উচিত

নয়। আধুনিক নিয়মে তো বাংলাদেশ এই প্রথম খেলছে!

সাবেক পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়, রেফারি এবং বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল ও কবাডি দলের কোচ এবং 'ফুটবলের নায়ক হতে হলে', 'হাডুডু খেলার আইন কানুন' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক ৪০ বছর বয়সী সদা হাস্যময় সাহেব আলীর ওই নির্দেশ নিয়ে ভারত কোনো আপত্তি করেনি। কারণ, এই সফরে জয় পরাজয়ের অপেক্ষা বড় উদ্দেশ্য কবাডির প্রসার। নিয়ম কানুন কঠোরভাবে মানা হলে ভারত তো আরও বেশি পয়েন্টে জিতত—প্রথম টেস্টে। কেননা, আইনে আছে হানা দিতে গিয়ে ধরা পড়লেও যদি দম থাকা অবস্থায় সে মিড লাইন বা মাঝ চড়াই স্পর্শ করে তবে সে বেঁচে যাবে এবং মারা পড়বে যে তাকে ধরেছিল।

মাজেদকে বুঝিয়েও শান্ত করতে পারলাম না। পরদিন 'বাংলার বাণী'তে সাহেব আলীর সমালোচনা করা হয়েছিল।

বিরতির সময় বেতার ভাষ্যকারদের দিকে লক্ষ্য করতেই চোখে পড়লো ম্যানেজার অচিন্ত্যবাবু। কাছেই ট্রানজিস্টর ছিল। তিনি কবাডি সম্পর্কে বলছিলেন। ওদিকে স্থানীয় এক ফটোগ্রাফার তুষারের ক্যামেরার দফা গয়া করে তুললেন। অনেক চেষ্টাতেও ফিল্ম খুলতে না পেরে বড়দের দেখালেন। অনেক পরিশ্রমে খুললেন এবং এক কর্মকর্তা তা এয়ারপোর্টে পৌঁছেও দিলেন।

বিরতির পরে উভয় দল রক্ষণাত্মক খেলতে লাগল। ভারত একটিও পয়েন্ট করল না। তবে সালেক বাংলাদেশের জন্য প্রথম পয়েন্ট আনল হানা দিয়ে। প্রথম টেস্টে শেষ পয়েন্টটি হানাদার ধরে এবং তাও সালেক কর্তৃক।

প্রথম টেস্টে হারলেও বাংলাদেশকে দুর্বল মনে হল না। অন্তত ভাল ক্যাচার তাদের রয়েছে। বিশেষত জাহাঙ্গীর। সে ভারতের প্রথম শ্রেণীর ক্যাচারদের সমকক্ষ।

কী করি, কোথায় যাই। খেলা শেষ। হাতে সময়ও যথেষ্ট। ভারতীয় সময় তখন সাড়ে চারটেও হয়নি। মাজেদের পরামর্শে বাস্কেটবল ম্যাচ দেখতে চললাম। উদ্দেশ্য তুটি। এক—খেলা দেখা। তুই—সাধারণের সঙ্গে মিশে অবস্থা বোঝা।

বাস্কেটবলের ওখানেও প্রবল ভিড়। কিন্তু সাংবাদিক খাতিরে বসার জায়গাও মিলল। সিমেন্টের ফ্লোরে আন্তর্জাতিক মানের রবারের বলে স্থানীয় তুই সেরা দলের খেলা চলছিল। উত্তেজনাও বেশ। সবচেয়ে ভাল লাগল উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের দেখে। সকলেই বয়সে তরুণ। খেলা শেষ হতেই মাজেদের সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়লাম। মাঝে দেখা হল এক তরুণের সঙ্গে। মাজেদ পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাংলাদেশের ভলিবল কোচ, পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস থেকে সম্প্রতি পাশ করে দেশে ফিরেছেন। পাতিয়ালা থেকে ঢাকা যাওয়ার আগে কলকাতায় কয়েকদিন থাকাকালে রাজ্য ভলিবল কোর্টে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ম্যাচ দেখেছেন। মেয়েদের নৈহাটি এ সি—বিজয়ী সংঘের লড়াইয়ের দিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

হামিদ না হালিম ঠিক মনে পড়ছে না, ওই কোচ বললেন, চলুন আড্ডা দেওয়া যাক। মাজেদ আমাকে খাওয়াতে উদ্যত। বাংলাদেশের সব মানুষই বোধ হয় এই রকম। সামান্য হলেও তাঁর সঙ্গে খেতে হবে, দীন হলেও তাঁর বাড়িতে পা দিতেই হবে। তা না হলে যেন অতিথিকে যথার্থ আপ্যায়ন করা হয় না। মাজেদকে বললাম, আমি আড়াইটেয় ভাত খেয়েছি, এখন রুচি নেই।

—পর পর ভাইবত্যাছেন নাকি, বললেন মাজেদ।

আমি শুধু চা-এ রাজি হলাম। কিন্তু স্টেডিয়ামের নিচে জনপ্রিয় মিষ্টির দোকানের কেবিনে ঢুকে মাজেদ ঢাকার বিখ্যাত মণ্ডা আর রসোমালাইয়ের অর্ডার দিলেন। আমি কলকাতার কে সি দাস আর

গাঙ্গুরামের কথা তুললাম। মাজেদের মন্তব্যঃ খাইয়া যান, মুখে লাইগ্যা থাকবো। কিসে আর কিসে। আপনারা বড় দেশের বড় শহরের লোক। মনে রাইখ্যেন ঢাকা একটা ছ্যাশের রাজধানী আর কইলকাতা একটি রাজ্যের রাজধানী।

তারপর ঢাকায় যে কদিন ছিলাম, মণ্ডা আর রসোমালাই আমার প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় স্থান পেয়েছিল। সেলোফিন কাগজে মোড়া 'আসল' খেজুর গুড় ও ছানার তৈরী মণ্ডার ঘ্রাণ কলকাতায় বসেও যেন পাচ্ছি। আর রসোমালাইয়ের কথা মনে পড়লেই জিভের অবস্থা কেমন হয় বোঝাই কাকে!

এবার যাত্রা ন্যাশনাল কোচিং সেণ্টার বা জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দিকে। স্টেডিয়ামের কাছেই সেণ্টারটি। কিন্তু সব অফিস বন্ধ। রবিবার বন্ধই থাকে।

—চলেন না আমাগো অফিসে। মাজেদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছলাম। যেতে যেতে মর্ণিং নিউজ, দৈনিক বাংলা, সাপ্তাহিক বিচিন্তা অফিস দেখলাম। তারপর নিউজ প্রিণ্টের রিল পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে বাংলার বাণী-তে। নতুন নতুন চেয়ার টেবল পনের কী ষোল জোড়া। কয়েকটি টেলিফোন। কর্মীরা সব তরুণ। মাজেদ পরিচয় করালেন বিমান ভট্টাচার্য-র সঙ্গে। সম্ভবত তিনি চিফ সাব এডিটর বা ওইরকম কিছু। দারুন আলাপী। হ্যাঁ, এটাই আমাদের নিউজ ডিপার্টমেণ্ট, রিপোর্টাররাও এখানেই বসেন। ডেস্কের লোক বলতে তখন বিমানবাবুই, বাকিরা রিপোর্টার। আধ ঘণ্টা ছিলাম ওখানে। কলকাতার দৃশ্যই চোখে পড়ল। আমাদের এখানে যেমন যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ, ছাত্র ফেডারেশন, আর এস পি প্রভৃতির বিবৃতি আসে, তেমনি ওখানেও আওয়ামী যুব লীগ, জাসেদ, কমিউনিস্ট পার্টির প্রেস স্টেটমেণ্ট।

মাজেদের ব্যবহারে এবারে একটু ক্ষুণ্ণ হলাম। আমাকে

বিমানবাবুর হেফাজতে রেখে লিখতে শুরু করলেন তিনি।

—ও খুব কাজ পাগলা বুঝি! বিমানবাবু আমার কথা শুনে বললেন,—আটটার মধ্যে সব পাঠাতে হবে। তাছাড়া মাজেদ আমাদের স্পোর্টস ডিপার্টমেণ্টের সর্বেসর্বা। চিফ রিপোর্টার, এডিটর যাই বলুন। এ তো আপনাদের অফিস নয়, স্পোর্টস ডিপার্টমেণ্টেই আট বা দশজন কাজ করবেন।

বিমানবাবুই আমাকে হোটেলের কাছে পৌঁছে দিলেন।

অফিসে গিয়ে লেখা শুরু করেছি। টেলেক্স মেশিনটায় টুং টুং টুং বেল্ বেজে উঠল।

জলিলুদ্দীন মেশিন দেখে বললেন, তুষারবাবুর মেসেজ।

—কি বলছে!

—হোয়াট অ্যাবাউট আওয়ার ম্যান? তাকে বলুন ঢাকা স্টেডিয়ামের খেলার ছবি হয়নি। পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

ডেসপাচ পাঠিয়ে খবরের কাগজগুলোয় চোখ রেখেছি, টেলিফোন বেজে উঠল। বাংলাদেশ টেলিভিসন থেকে ভারতীয় দলের ম্যানেজার জানালেন, তারা ওখানে টেলিভিশন প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত।

ঘরে ফেরার আগে জলিলুদ্দীনের কাছে জেনে নিলাম বাংলাদেশের অন্যত্র টেলিফোন, টেলিগ্রাম সংযোগ কেমন। কলকাতার সঙ্গে কানেকশান পেতে কতক্ষণ লাগবে! বললাম, আগামীকাল বিকালে যশোহর যাবো। তিনি জানালেন, যশোহর থেকে কলকাতা টেলিফোন লাইন পেতে দেরী হবে না। ঢাকা তো ডায়াল করলেই পাওয়া যাবে। ওঁকে বললাম, যশোহর থেকে কলকাতা না পেলে ঢাকা লাইন নিয়ে এখানে মেসেজ পাঠাবো। আপনি টেলেক্সে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন।

৯টা নাগাদ ঘরে ফিরতেই কাজী আনিসুর রহমান, এম এ হামজা হাজির। এলেন জামিল। আগামীকাল ১১ তারিখের প্রোগ্রাম জানালেন: দশটার মধ্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে সাভারে যাবো।

লাঞ্চ স্টেডিয়ামে, তারপর এয়ারপোর্ট এবং তিনটের ফ্লাইটে যশোহর

জামিল বয়সে আমাদের চাইতে ছোট। বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার জনাব হাসানাতের ছেলে তিনি। আনিস ও হামজা ভাই ওর বাবার বন্ধু, তাই সংকোচ বোধ করছিল। সে দ্রুত চলে গেল পূর্বরাগ হোটেলে খেলোয়াড়দের ও কোচকে আগামী কালের প্রোগ্রাম জানাতে। এবার জমিয়ে আড্ডায় বসলাম আনিস ও হামজা ভাই এবং সালভি, আমি ও অচিন্ত্যবাবু।

ওরা জিজ্ঞাসা করলেন কেমন লাগল আজকের খেলা।

—বাংলাদেশ বেতার ডিফিট কইরা দিল বাংলা রিলে কইরা। আমার বাঙাল কথা শুনে হামজা বললেন, মশাই আমাগো ভোগান ক্যান।

—তবে আমার জেলা খুলনের কথা শোনেন। অচিন্ত্যবাবু কহেন তাঁর জেলা যশোরের কথা। আমি যে আসলে বাঙাল তা তিনি বিশ্বাস করলেন পাশপোর্টে প্লেস অফ বার্থ দেখে।

এবার আমাদের ম্যানেজারকে চেপে ধরলাম। মশাই, ঢাকা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার এলেন, আর আমাদের হাইকমিশন অফিসের কর্তাদের দেখলাম না কেন? একটা ন্যাশনাল টিম এসেছে, তাদের কি কোনো কর্তব্য নেই? শিষ্টাচার বোধও থাকা উচিত। আমি কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিয়েছি, কলকাতায় ফিরে সব জানাবো। আসলে আমাদের এমব্যাসিগুলো সর্বত্রই এই রকম অকেজো। যার জন্য বিদেশে আমাদের ভাল কাজেরও দাম বা নাম নেই।

অচিন্ত্যবাবু বললেন, কেউ আসেনি তা নয়। হাইকমিশন অফিসের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ জালালুদ্দীন গাজির ছিলেন। তিনি প্রতিদিন খবরও নিচ্ছেন আমাদের টিমের

—হাইকমিশনার না পারুন অন্ততঃ ফার্ষ্ট সেক্রেটারিকে এক্সপেক্ট করেছিলাম মাঠে। তাছাড়া হাইকমিশনারই বা আসবেন না কেন? অন্য যে কোনো বিদেশী দল এলে দেখতেন তাদের গোটা এমব্যাসি হুমড়ি খেয়ে পড়ত। এখন বুঝছি সন্তোষকুমার ঘোষ আনন্দবাজারে যথার্থই লিখেছিলেন—'ধিক এই কূটনীতিকে'।

এরপর খেয়ে শুতে যাবো, হঠাৎ মনে পড়লো কাল ভোরে উঠতে হবে। টেলিফোন তুলে এক্সচেঞ্জকে বললাম, ছটার মধ্যে না জাগলে অনুগ্রহ করে ডেকে দেবেন। আমি 'গুডনাইট' বললাম। অপর প্রান্ত থেকে মিষ্টি গলায় ভেসে এল, 'শুভ রাত্রি'। একটি কথার বদলে আর একটি কথা। ইংরাজীর বদলে বাংলা। বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল যেন। বাংলা ভাষার পীঠস্থান কলকাতায় এই ভাষার দাম বুঝিনি। বুঝিনি পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার যথার্থ মর্যাদা দেখলাম ঢাকায়—বাংলাদেশের রাজধানীতে।

১১ ফেব্রুয়ারী সকাল ছটার আগে ঘুম ভাঙলেও নির্দিষ্ট সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

—এটা ৫২ নম্বর ঘর?

—হ্যাঁ।

—সুপ্রভাত। আমি দূরআলাপনী থেকে বলছি। এখন ছটা বাজে। আপনার কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত!

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে আধুনিক বিখ্যাতদের সকলের রচনা কম বেশি পড়েছি। ২৫শে বৈশাখ কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের নানা অনুষ্ঠান দেখেছি। ১৯৫১তে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে দিনের পর

দিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছি। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি এমন ভালবাসা কখনও দেখিনি।

হয়ত কেউ কেউ আমাকে এই নিয়ে 'ভাবাবেগ-প্রবণ' আখ্যা দেবেন। আমি কিন্তু সে কথা মেনে নিতে রাজি। তবে তাদের আমি বলি (যদি তিনি ভারতীয় হন), কই আপনার দেশের কোনো ফাইভ স্টার হোটেলে টেলিফোন তুলেই কেউ কি আপনার রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে কথা বলবেন ? না, ইংরাজির তুবড়ি ছুঁড়বেন !

রিসিভার রেখে এই সব ভাবছি। আবার ফোন বাজলো। আবার সেই 'সুপ্রভাত।' আমি জাহীদুল ইসলাম বলছি, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার।

জাহীদ অর্থাৎ আমার শত্রুঘ্ন সিংহ—ঢাকার শট গান। জিজ্ঞাসা করলেন—'গোছল (স্নান) নাস্তা (ব্রেকফাষ্ট) হইছে' ?

—নাস্তা শেষ, এবার গোছল হবে।

আমরা বাক্স পেটরা গোছাতে ব্যস্ত। এগারটার মধ্যে বের হতে হবে।

সমস্যায় পড়লাম তল্পিতল্পা নিয়ে। দিন চারেক পরে ঢাকায় ফিরব। কিন্তু সমস্ত জিনিস সঙ্গে নিয়ে যাবো কেন ? কিছু রেখে গেলে তো হয়। ম্যানেজার বললেন, আপনাদের অফিসে রাখুন। তুষারও সেই পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিল। মিস মাফিটকে ব্যাপারটা সব জানালাম। তিনি আর তুষারের ঘর পর্যন্ত ওসব তুলতে দিলেন না। বললেন, আমার ঘরেই রাখুন। তুষারের লোকজন বা তুষারকে তো সব সময় পাবেন না। আমরা তাই করলাম।

দুই দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে বের হতে দেরী হয়ে হয়ে গেল। অভিভাবক জামিল বললেন, ঢাকা শহরটা আগে ঘুরে দেখুন। দর্শনীয় সব কিছু নিউ ঢাকায়। তা হাইকোর্ট বলুন, বাংলাদেশ বেতার বলুন,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ময়দান, [illegible] হল, সেক্রেটারিয়েট, গণভবন এনজিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] নতুন শহরে।

এসব দ্রুত ঘুরে সাভারের দিকে চললাম। [illegible] ঢাকার শহরতলী অঞ্চল।

শহর পার হতেই বাংলাদেশের আসল চেহারা [illegible]। ফেব্রুয়ারী মাসে ধান দেখতে পাবো আশা করিনি। কিন্তু শহরকে পিছনে ফেলতেই মীরপুর—সেখানে অবাঙালীদের ভিড় [illegible]। এই মীরপুরেই মুক্তি যুদ্ধের সময় বাঙালী হত্যা হয়েছিল সর্বাধিক। মীর পুরের পরেই ছোট নদী। ব্রীজ থাকলেও পুরনো হয়ে গিয়েছে। ওর ওপর দিয়ে হালকা যানবানবাহন চলে। যায় ট্যাকসি, প্রাইভেট গাড়ি ইত্যাদি। হেঁটে চলার পথ তো আছেই। কিন্তু লরী [illegible] বাস যাওয়া নিষেধ। পুরনো ব্রীজের ধারেই নতুন ব্রীজ তৈরী হচ্ছে।

আমাদের বাস বাঁমদিকে নেমে এল মোটরচালিত ফেরী পার হওয়ার জন্য। পনের মিনিট কাটল সেখানে। নদী অতিক্রম করে বাস দ্রুত বেগে ছুটে চলল। বাসে সকলেই চুপ চাপ। গাম্ভীর্য ভাঙলেন বাংলাদেশের কোচ সাহেব আলী। তাঁর হুইসিল বেজে উঠল। বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা বাংলা গান শুরু করল। শেষ হতেই আবার তিনি বাঁশি বাজালেন। এবার তাঁর নির্দেশ 'ভারত কিছু করুক'। কিন্তু কেউ রাজী হল না। একজন [illegible] মুখের দিকে তাকাচ্ছে। অবশেষে পঁয়তাল্লিশ বছরের নিশাকর চক্রবর্তী আরম্ভ করলেন। হাততালি কুড়োতেই তামিলনাড়ুর [illegible] নিজের ভাষায় যা শুরু করল, তাতে চমৎকার তাল লয় আছে মনে হল। কিন্তু মানে কেউ বুঝলাম না। তবুও বাসশুদ্ধ সকলেই হাতে তালি দিয়ে দিয়ে ছন্দ বজায় রাখছিলেন।

বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে বাস ঘুরল। [illegible] বললেন, এই আমাদের গন্তব্যস্থল। এটি জাতীয় শহীদ মিনার। স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা

প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের স্মৃতিতে তৈরী হচ্ছে। শিলান্যাস ফলকে দেখলাম বঙ্গবন্ধুর নাম।•

দুদিন আগে যুগোশ্লোভিয়ার মার্শাল টিটো ওখানে এসেছিলেন, এখনও তার চিহ্ন। অস্থায়ী আলোর ব্যবস্থা তখনও খুলে নেওয়া হয়নি রাস্তায় রঙের প্রলেপ রয়েছে। তোরণের ফুল, পাতা একেবারে শুকোয়নি। ওখানে নেমে অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেরার পথে আটকে গেলাম মীরপুরের কাছে সেই ফেরী পার হতে গিয়ে। বাস, লরীর বিরাট লাইন। এখানেও ট্রাফিক জ্যাম। কলকাতা ছেড়ে এসেও নিস্তার নেই? গুণে গুণে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটালাম। খিদেও পেয়েছে, ওদিকে যশোরের প্লেনের সময়ও হচ্ছে পৌনে একটা বেজে গেল। এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং টাইম দুটো। এদিকে দুপুরের খাওয়া সারতে হবে স্টেডিয়ামে গিয়ে।

... গতিতে বাস চলেছে ঢাকার দিকে। রসিক সাহেব আলী বললেন চালককে, "যাই করেন প্রাণে মাইরেন না। আমাগো বদলা ... লইয়া যাইবো। অন্ততঃ ভারতের অতিথিদের বাঁচাইয়া ... শেফ-দ্য মিশন সালভি এতক্ষণে মুখ খুললেন, বাঙাল কথার ... আমাকে দেখিয়ে—"বাবা সবকো মার দো। লেকিন এই রিপোর্টার লোকগো মাৎ করো। ও বাঁচ যায়েগা তব সব নিউজ ... মে পাবলিশ হোগা।"

আমি বললাম রিপোর্টার কি এত তাড়াতাড়ি মরে? এরা আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। ভুল হিন্দীতে ওকে বললাম, রিপোর্টার কিসের থেকে হয় জানো?

—ক্যাইসে?

—তবে শোনো। আচ্ছা অ্যানিমালকা অন্দর ধূর্ত আউর চালাক তো শৃগাল হ্যায়।

সালভির উত্তর—জরুর।

—শকুন জানতা হ্যায়, ভালচার।

—জরুর।

—৬৫টি টা শিয়াল মরলে পরের জন্মে ওরা একটা শকুন হয়ে জন্মায়।

—ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তোম্ রিপোর্টারকা বাৎ বোলো।

—তাই তো বলছি।

—হিন্দী মে বোলো, আভি বাংলা পুরা সমঝ্তা নেহী।

—একশো পঞ্চাশটো শকুন মরকে পর জনমে একটো রিপোর্টার হোতা হ্যায়।

আমার কথা শেষ না হতেই নিশাকরের জিজ্ঞাসা—তা তো হল, চীফ দ্য মিশন ক্যায়সে হোতা হ্যায় বললেন না তো।

—তিনজন রিপোর্টার মরলে পরের জন্মে একজন শেফ দ্য মিশন হয়।

এস এন সালভি এই শুনে আমাকে এই মারেন সেই মারেন অবস্থা।

বাস তখন স্টেডিয়ামের গেটের মুখে থেমে গেছে। আমি পিঠ বাঁচাতে দ্রুত নেমে পড়েছি।

দ্রুত সকলেই নেমে পড়লেন। স্টেডিয়ামের দোতলার হলে ঢুকতেই হামজা ভাই ধমক দিলেন, এত দেরী ক্যান। আপনাগো কইছিলাম কাছাকাছি ঘুইর‍্যা আসেন। তা না কইর‍্যা অত দূরে গ্যালেন ক্যান্। প্লেন কি লেট করবো!

সাহেব আলীর মস্ত গুণ—সব আগুন নিভিয়ে দিতে পারেন যেমন, তেমনি ঠাণ্ডা কিছু গরমও করতে জানেন। আসলে হৈ চৈ তিনি ভীষণ ভালবাসেন। দলের ছেলেদের ট্যাক্ল করতেও জানেন। তবে রেগে গেলে অনেক সময় আমাদের ক্রিকেট কোচ কার্তিক দা-র (কার্তিক বসু) মত ছেলেদের বাপান্ত করে ছাড়তে ভয় পান না। সাহেব আলী খেলা পাগল মানুষ। দুর্নীতি, অসত্য বরদাস্ত করতে পারেন না। এবং পারেন না বলেই বোধহয় মুক্তি সংগ্রামের সময়

বড় ছেলেকে হারিয়েও শোকে মুহ্যমান হননি। এই সাহেব আলী প্লেন ছেড়ে দেবে শুনে বললেন, চল্লিশটা টিকিট তো আমাগো। গোটা প্লেন বুক কইরা লইছে কবাডি টিম। আমরা না গেলে খালি যাইবো নাকি প্লেন!

আসলে প্লেনের ৪০টি আসনই ছিল দুই কবাডি দলের খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজার, এই অধম সাংবাদিক, রেফারি, আম্পায়ার এবং বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্‌সের সম্পাদক সৈয়দ শাহীদুল ইসলামের নামে বুক করা।

কোনো রকমে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেলাম। মাছের ঝোল আর চিকেন কারি এবং ভাত। বাংলাদেশের মেনুতে প্রতিদিন মুরগী থাকলেও স্টেডিয়ামের নিচের হোটেল থেকে সরবরাহ করা অমন স্বাদ যুক্ত মুরগীর ঝোল একদিনও খাইনি। আমি অবশ্য সালভির নিরামিষে ভাগ বসিয়েছিলাম। সেই নিরামিষে হঠাৎ মাছের কাঁটা পেলাম। রা কাড়িনি ওই নিয়ে। কেননা, তাহলে সালভিকে অনাহারেই দুপুরটা কাটাতে হত। খাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করলাম, সবজি ক্যাইসে লাগা? তাঁর উত্তর, এতনা আচ্ছাওলা সবজি কভী নেহী খায়া।

বুঝলাম এতদিনে সেই কথাটা কত খাঁটি—না জেনে সাপের বিষও খাওয়া যায়।

চটপট আবার বাসে উঠলাম সকলে। দুটোয় এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং টাইম। আর এখন আড়াইটায় আমরা স্টেডিয়াম এলাকায় সাহেব আলীকে বললাম, কী কোচ সাহেব সব ঠিক হ্যায় তো! প্লেন যেন না ছাড়ে। তিনি পূর্ণ ভরসা দিলেন।

এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখা বছর এগার একটি ছেলের সঙ্গে। নিজেই পরিচয় দিল—"আমার নাম সাগর, আব্বারে কইয়া দ্যান কাল যশোরে যাবো।"

সাগর শাহীদুল ইসলামের একমাত্র পুত্র, জাহীদের ভাইপো।

দারুন খেলা পাগল। বাবাকে, চাচাকে ভীষণ ভয় পায়। ওর বাবাকে সুপারিশ করতেই বললেন : লোক পাইলে জাবা। বিদেশী চাচারে যখন ম্যানেজ করছ, আর না করতে পারি!

—আব্বা প্লেনের টিকিট?

—সে পারমিশনও দিলাম।

সাগরের তখন যেন আর্কিমিডিসের মত আনন্দ।

সে লাফাতে লাফাতে গাড়ির কাছে চলে গেল। লাউডস্পীকারে তখন আমাদের ডাক পড়েছে—যশোরের যাত্রীরা প্রস্তুত হোন।

তিনটে দশ। বিমান বন্দরে অসংখ্য ব্যক্তি ব্লেজার পরা ভারতীয় কবাডি খেলোয়াড়দের সঙ্গে নানা আলোচনায় ব্যস্ত। প্রত্যেকেই খুশি। বাঙালী হওয়ায় সবচেয়ে সুবিধা নিশাকর ও জয়দেবের। মারাঠি সুভান্নাও বলছে—আপনাদের নমস্কার, জয় বাংলা। আমরা বাংলা-দেশ বিমানের বাসে চড়ে প্লেনের কাছে পৌঁছলাম, প্লেন ছাড়ল নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পরে। আমরা উড়ে চলেছিলাম মাত্র ছয় হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে। আমার দৃষ্টি নিচের দিকে। কলকাতা থেকে ঢাকা আসার সময় আকাশ থেকে বাংলাদেশ দেখার সুযোগ পাইনি—সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায়। আজ সে সুযোগ পেলাম। সোনার বাংলাকে চিনতে গেলে, দেখা প্রয়োজন তার নদী, তার ধানক্ষেত, তার শ্যামল প্রান্তর, তার সোনার ফসল। বাদ সাধলো প্রকৃতি। মেঘলা আকাশ। ককপিটে গিয়ে পাইলটকে জিজ্ঞাসা করলাম—আবহাওয়া কি এমনিই থাকবে। তিনি বললেন—না, একটু বাদেই পরিষ্কার হতে পারে। হলও তাই। পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল—ভূগোলের এই চিরপরিচিত সংজ্ঞা বাংলাদেশে গেলেই বোঝা যাবে। ছোট বড় আঁকা বাঁকা হয়ে অজস্র নদী। আমরা আকাশ থেকে ছোট ছোট শহর চিনতে পারছিলাম। দেখা যাচ্ছিল পদ্মার স্টিমার। ফেব্রুয়ারী শীতের শেষ, নদীতে জল নিতান্তই কম। কিন্তু বর্ষায় যে তারা কত দুরন্ত হয়ে ওঠে সে ছাপ ফেব্রুয়ারীতেও দেখলাম শূন্য থেকে। বিচিত্র

তাদের গতিপথ, অদ্ভুত তাদের মেজাজ। 'নদীর একূল গড়ে, ওকূল ভাঙে' গানটি যত সত্যিই হোক তদপেক্ষা সত্যি বোধহয় নদী সম্পর্কে 'ও তোর কোন বাঁধন নাই' গানটি।

বাংলাদেশের নদী সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। হাতের কাছের ম্যাপ দেখেও বোঝা দুঃসাধ্য। হঠাৎ বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখে 'পদ্মা, পদ্মা' চেঁচিয়ে উঠলাম। আমাদের অবাঙালী খেলোয়াড়দের বললাম—দিস ইজ্ পদ্মা। মনে হল—ভুল বললাম না তো! কনফার্ম হতে গেলাম পাইলটের কাছে, তিনি শুধরে বললেন, এটি মধুমতী।

আবার আসনে বসলাম। সামনেই জ্বলে উঠেছে সেই পরিচিত লেখা "আসন বন্ধনী বাঁধুন"। অর্থাৎ যশোহর এসে গিয়েছে। জানালা দিয়ে দৃষ্টি ফেলতেই টার্মিনাল বিল্ডিংস ও এয়ারপোর্টে অগনিত লোক চোখে পড়ল। উপর থেকে রানওয়েটি বেশ ঝকঝকে মনে হচ্ছিল। ল্যাণ্ড করতেই সেই ধারণার সমর্থন পেলাম। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের, বিশেষত খুলনা ডিভিশনের সবচেয়ে বড় ক্যাণ্টনমেণ্ট এই যশোহরে। তাই এর গুরুত্ব কম নয়। পাকিস্তানী আমলেই এর উন্নতি হয়েছিল। শুনলাম ঢাকা—যশোহর এখন নিত্য আপ-ডাউনে ৮+৮=১৬টি এয়ার সার্ভিস চালু হয়েছে, তবুও যাত্রী চাপ কমানো যাচ্ছে না। কারণ বাংলাদেশে এখনও ট্রেণ সার্ভিস নিয়মিত হয়নি। প্রতিটি গাড়িই দেরীতে যাতায়াত করে। রেলে যাতায়াতের উন্নতি হয়নি নাকি প্রধানত কয়লার অভাবে। এছাড়া কুশলী কর্মীও কম। তৃতীয় ভরসা স্টিমার বা লঞ্চ। কিন্তু শীতের সময় নদী মজে যাওয়ায় স্টিমারগুলি অনেক ঘুরে যাতায়াত করে, তাতে সময় বেশি লাগে। তাই একটু যারা সমর্থ, তারা বিমানই বেছে নেন। তাছাড়া বিমানে ভাড়াও বেশ কম।

ঢাকায় যেদিন নেমেছিলাম, ঠিক প্রায় তেমনই অভ্যর্থনা যশোহরেও। দলে দলে তরুণরা এসে সকলের গলায় মালা পরিয়ে দিতে লাগলেন। সকলের আগে পরিচয় হল যশোহর জেলা স্পোর্টস

অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সামসুল হুদার সঙ্গে। চিকিৎসক মানুষ; ভীষণ রসিক এবং কর্মঠ। জেলা শাসক তথা কমিশনারের অপেক্ষা এখানে তাঁর ক্ষমতা অনেক বেশি। বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার স্বল্প সময়ের নোটিশে তিনি দ্বিতীয় টেস্টের আয়োজন করেছেন। আসলে দ্বিতীয় টেস্ট হওয়ার কথা ছিল খুলনা স্টেডিয়ামে। কিন্তু ওই স্টেডিয়াম পুনর্গঠিত হওয়ার খবর পেয়ে শেষ মুহূর্তে স্থান বদল হয়।

ডাঃ হুদার পরে আলাপ হল অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার ফজলুল করিম-এর সঙ্গে। তিনিও খেলা পাগল। আবার দেখা সট্গান— জাহীদুল ইসলামের সঙ্গে। জাহীদের বাড়ি এই যশোহর জেলাতেই। বুঝলাম ওর দাদা শাহীদুল ইসলামও একই কারণে এসেছেন। তাছাড়া দ্বিতীয় টেস্ট সফলের দায়িত্ব এদের দুই ভাইয়ের উপরেও খানিকটা।

জাহীদকে বললাম, আপনি যখন আছেন, আমি নিশ্চিন্ত। আমাদের কথার মাঝে ডাঃ হুদা তাড়া দিলেন, এইদিকে আসেন। আপনাদের জন্যি একজন মিনিস্টার দাঁড়ায়ে আছেন।

চেহারায় ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে দারুণ মিল। ফর্সা, নীরেট স্বাস্থ্য, সাড়ে ছয়ফুট উচ্চতায়, ক্যাস্ট্রোর মতই দাড়ি গোঁফ। করমর্দনের সময় বুঝলাম গায়ে শক্তিও আছে। ইনি খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আমিরুল ইসলাম। মন্ত্রী হওয়ার আগে পেশা ছিল ব্যারিস্টারি। তিনি পরের ফ্লাইটেই ঢাকা যাচ্ছিলেন। বললেন, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত। কিন্তু সঙ্গে থাকতে না পারায় দুঃখিত।

বিমান বন্দরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চললাম শহরের দিকে। জনতার ভিড় তখনও কিছু কিছু রয়েছে। একটু যেতেই চোখে পড়ল ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া। যশোহরের সেই বিখ্যাত ক্যান্টনমেন্ট। ১৯৫৫-এ ভারতীয় সৈন্য এই সেকটরে সবচেয়ে বাধা পেয়েছিল এখানেই। রাস্তার দুধারে সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত এলাকা। তাদের

নানা অফিস, নানা বিভাগ। মাঝে মাঝে সেনাবাহিনীর লোকদেরও দেখলাম। তারা বাগান পরিস্কার করছেন, রুটমার্চে বেরিয়েছেন। তারপর সেই রেল লাইন। খুলনা-কলকাতা রুট। আপাতত অবশ্য খুলনা-বেনাপোল পর্যন্ত যাত্রীগাড়ি চলছে।

ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে চমৎকার পিচের রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে আমরা শহর সংলগ্ন একটি সরকারী বাংলোয় পৌঁছলাম। গোলাপ আর নানা মরশুমী ফুলে ঘেরা একতলা বাড়ি। ছোট ঝর্ণার মধ্যে রঙীন মাছ। চমৎকার পরিবেশ। কাছাকাছি আরও সরকারী বাংলো। স্থির হল ভারতীয় দল দুটি বাড়িতে ভাগাভাগি করে থাকবে। খাওয়ার ব্যবস্থা একই বাড়িতে। ফরেস্ট বাংলোয়। এখানেই রইলাম আমি, ম্যানেজার ও কোচ একটি ঘরে। আর দুটি ঘরে কয়েকজন খেলোয়াড়। অন্য বাড়িতে সালভি গেলেন কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে।

বেশ ঠাণ্ডা ছিল সেদিন। ওদিকে মশার দাপটও খুব। যাদবপুর কসবাকেও হার মানায়। চা পর্ব শেষ হতেই জাহীদ এলেন। —চলেন দাদা স্টেডিয়ামে যাই। গাড়িতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। ছোট্ট শহর যশোহর। স্টেডিয়ামে চমৎকার প্যাভিলিয়ন। অফিস রয়েছে। কয়েকমাস আগে এখানেই রাশিয়ার একটি ফুটবল টিম এসেছিল। বিরাট মাঠ, দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তবে পাকা গ্যালারি সারা মাঠ জুড়ে নেই। বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার হাসানাৎ আগেই এসে মাঠের তদরকী করছেন। অন্ধকার হয়ে গেছে। তবুও তাঁর কাজ শেষ হয়নি। লাইট জ্বেলেই একদল লোক নিয়ে ব্যস্ত। তবে কোর্ট বেশ নরম মনে হল। স্টেডিয়াম অফিসে ঢুকতেই ডাঃ হুদা আর একদফা চা খাইয়ে দিলেন। এলেন শাহীদুল ইসলাম। তাঁর কথায় ঢাকা স্টেডিয়ামে ফোন করলাম। ডায়াল করলেই লাইন পাওয়া যায়। তবে যে নম্বর চাই তার আগে ৯১ ঘুরিয়ে পর পর ডায়াল করতে হবে। প্রথম বারেই পেয়ে গেলাম ঢাকা স্টেডিয়ামে

বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার লাইন ২৪৬৯৯০। আনিসুর রহমান গলা শুনেই রিসিভার তুলে দিলেন ওখানে বসে থাকা ইত্তেকাফের বদিউজ্জামানের হাতে। পৌঁছবার খবর দিয়ে চললাম বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের হোটেলে।

—কী খাবেন যশোহরের স্পেশ্যাল কিছু? ভোজন বিলাসী শাহীতুল ইসলামের জিজ্ঞাসা।

—বনগাঁর কাচা গোল্লা বিখ্যাত হলেও মূলত তা তো যশোহরেরই ছিল। তবে ওর হাল তো এখন জানিনা। আপাততঃ সাঁঝের খেজুর রস যদি মেলে।

তিনি দৃষ্টি ফেরালেন ডাঃ হুদার দিকে। 'ইনি খুলনের মানুষ, রিপোর্টার তাও ভারতের। মেহমান লোক মুখ দিয়ে যা বার হইছে, তা ফ্যালা যায় না। ব্যবস্থা করতি হবেনে।'

ডাঃ হুদা আশ্বাস দিলেন আমার এহানে আইছেন। কোনোডাই অপূর্ণ থাকবে না।

কিন্তু সেই হোটেলে বসে রসের আগে গণ্ডাখানেক সিঙাড়া আর গণ্ডা দুয়েক কাঁচাগোল্লা খেতেই হল।

জাহীদকে বললাম, যশোহর টাউনে কখনও আসিনি। গাড়িটায় উঠে শহরটা ঘুরে আমাদের আস্তানায় যাবো। শহরের বাজারের গায়েই হোটেল। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাজার ফুঁড়ে বড় রাস্তার দিকে এগোলাম। বাঁদিকে যশোহর পাবলিক লাইব্রেরী। চমৎকার লাগল বিদ্যুতালোকের সাইন বোর্ড। তাতে লেখা—"আপনি আজ কি বই পড়েছেন?" এই ছোট্ট শহরের লাইব্রেরীর সামনে বড় বড় হরফে লেখা ওই সাইনবোর্ড অবাক হওয়ার মত বৈকি! জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব গ্রন্থাগারেব যে কতখানি এঁরা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

বাংলোয় ফিরে দেখি ডিনার প্রস্তুত। কেউ কেউ খেয়েও নিয়েছে। আমার পেটে তখন সিঙাড়া, কাঁচা গোল্লা সতেজ। মশার ভয়ে

মশারীর ভিতরে বসে রিপোর্টটা তৈরী করে পূর্বানীতে লাইন ধরলাম আনন্দবাজার অফিসে। আশ্চর্য এবারও একবারেই পেলাম ২৫৯৬৪৩। জলিলুদ্দীনের সাড়া এল ও প্রান্ত থেকে। তিনি জানালেন, বিদেশমন্ত্রী সর্দার স্বর্ণ সিং ১৩ তারিখে ঢাকা আসছেন, তুষার বাবুও তার আগে কলকাতা থেকে ফিরবেন। জলিলকে ডিকটেশন দিয়ে ডিনার টেবলে বসে গেলাম! ভাত, রুটি, তরকারি, মাছ, মুরগী, মিষ্টি কী নেই! আমার খিদে ছিল না। কিন্তু সকলের জুলুম 'খেতেই হবে।' সালভির জন্য নিরামিষ খাদ্য ডিমের কারী সবজি ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তিনি খেলেন না একই চামচে সবকিছু পরিবেশিত হচ্ছিল দেখে। উদ্যোক্তারা একটু বিপদে পড়লেন। কিন্তু সে সমস্যা মিটে গেল খাওয়ার পরেই বড় বড় অ্যালুমিনিয়ম হাড়ি ভর্তি খেজুর রস আসায়।

সালভি শুরুতে খেতে চাননি উত্তেজক পানীয় ভেবে। ওকে আমরা সামান্য দিয়ে টেষ্ট করতে বললাম। সালভি এবার গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন।—"যত খুশি দিন, এ তো অম্রুত (অমৃত) হ্যায়।" খেলেন কোচ ওয়ালঞ্জ এবং প্রতিটি খেলোয়াড় গ্লাসের পর গ্লাস।

যশোহরের সেঁঝো রস যিনি খাননি, তিনি বুঝবেন না এর স্বাদ। হুইস্কি, রামে নেশা হতে পারে, কিন্তু খেজুর রসের মত তৃপ্তি আর কিছুতে আছে বলে আমার জানা নেই। সত্যিই 'অমৃত'।

১২ ফেব্রুয়ারি।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি আবার সেই অমৃত এসেছে আমাদের জন্য। আমি দ্রুত খবর পাঠালাম পার্শ্বের বাংলোয় সালভির কাছে। হাত মুখ না ধুয়েই তিনি ছুটে এলেন অমৃতের লোভে। বললেন, কাল এ লোক কেয়া চিজ খিলায়া। আচ্ছা নিদ হুয়া, সুবেমে বাওয়েলস ভি আচ্ছা ক্লিয়ার হোগায়া।

একটু পরে জাহীদ এসে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—'দাদা

ডুবে গেছি। বিকালে খেলার মাঠে একদম লোক আসবে না। আজ এখানে বাস ধর্মঘট ডাকিছে। সকাল থেকেই কিছু চলতেছে না। আমরা সান্ত্বনা দিলাম—টাউনের লোক তো আছে!

—সে আর কয়জন? স্টেডিয়াম ভর্তি না হলে ভাল লাগে? জনসাধারণের জন্য এত আয়োজন, এত ব্যবস্থা, তারা যদি না দ্যাখলেন, তা হলিই তো সমস্ত ব্যাপারডাই মাটি হবেনে।

—দেখা যাক না!

জাহীদের সব আশঙ্কা, সব দুর্ভাবনা দূর হল বিকালে স্টেডিয়ামে ঢুকতেই। তিনিই আমাকে সঙ্গে করে নিয়েছিলেন। স্টেডিয়াম তো পূর্ণই, লোক বসেছে মাঠের মধ্যেও, এমন কি কাছে নির্মীয়মান হোস্টেলের ছাদেও শত শত দর্শক।

ডাঃ হুদা বললেন, অগ্রিম টিকিট বিক্রি করছি এই কদিন ধরে। যারা কিনছেন তারা না আসে পারেন? বাস বন্ধ হলে কি হবে, রিক্সা, সাইকেল আর পা তো আছে? তবে বাস চললেই অসুবিধে হতো। আমরা জায়গা দিতি পারতাম না। পুলিশের কাজ বাড়ত। এডাই ভাল হইছে দেখতেছি এখন--আল্লা যা করেন ভালোর জন্যিই।

সারা স্টেডিয়াম জুড়ে, এখানেও দুই দেশের পতাকা। এখানেও উৎসবের দৃশ্য। সারা শহর ও শহরতলী ভেঙে পড়েছিল। মেয়ে দর্শকও প্রচুর। সকালের আশঙ্কা আর বিকালের অতি আনন্দ জাহীদের স্নায়ুতে বেশ চাপ পড়েছিল মনে হল যখন পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী সোহরাব হোসেন দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সেরে দুই দেশের জাতীয় পতাকার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জাহীদের কাজ ছিল টেপ রেকর্ডারে প্রথমে ভারতের ও পরে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর। কিন্তু তাঁরই ভুলে জনগন মন-র শেষাংশটুকুই শোনা গেল মাত্র। মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন ঘোষণার পর

জাহীদের চোখে মুখে সে কী শুষ্কতা। যেন মহা অন্যায় করে ফেলেছেন।

—দাদা বাঁচাইয়া দিয়েন কিন্তু।—জাহীদের অনুরোধ।

—একই কথা বললেন, আমাদের ম্যানেজারের কাছে গিয়েও।

বললাম, মেশিনের ব্যাপার ওর জন্য এতো ভাবনার কী আছে?

—চিন্তার না? আপনারা অতিথি। সেই দেশের জাতীয় সঙ্গীত শুরু থেকে বাজলো না? কত বড় গর্হিত কাজ করলাম। এই নিয়ে কত কথা হতে পারে জানেন?

অচিন্ত্যবাবু বললেন, ম্যানেজার হিসাবে কথা দিচ্ছি এ নিয়ে কোনো কথা উঠবে না। এটা একটা দুর্ঘটনা, ধরেই নিন না জাহীদ ভাই!

—এতক্ষণে জাহীদ আশ্বস্ত হলেন।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে প্রথম টেস্টের সেই শেখর শেঠী, এস সুভান্না, বসন্ত সুদ, এম এস বিচারে, জয়দেব সাঁতরা, মহম্মদ এজাজুল্লা গৌরি ও শেখর পাতিল রইল। আর বাংলাদেশ দলে—মকবুল হোসেন, মহঃ সালেক, রোস্তম আলি শেখ, জাহাঙ্গীর আলম, আমির হোসেন পাটোয়ারি, জুলফিকর আলি, আবুল হাশেম ও বিল্লাল হোসেন। রেফারী—ওসমান গণি, আম্পায়ার—মধুসূদন দাস সরকার ও জেড আলম।

খেলার শুরুর আগের মুহূর্তে এক পুলিশ অফিসার খবর দিয়ে গেলেন, এই ম্যাচ দেখতে কলকাতা থেকেও কয়েকজন দর্শক এসেছেন হরিদাস পুর সীমান্ত পার হয়ে ট্যাক্সিতে।

দ্বিতীয় টেস্টেও ভারত জিতল ২১—১৭ পয়েন্টে। কিন্তু বাংলাদেশ দলে খেলায় যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেল। এদিনও তাদের অধিকাংশ পয়েন্ট এসেছে হানাদের ধরে এবং সে কৃতিত্ব জাহাঙ্গীর আলমের!

ভারতের বাবরী চুলের বসন্ত সুদ ব্যূহের মধ্যে ঢুকে সাধারণত উঁচু লাফ দিয়ে থাকে বেরিয়ে আসার জন্য। কিন্তু তার সেই কৌশল কার্যকর হয়নি। প্রতিবারই সে ধরা পড়েছে। ঢাকা স্টেডিয়ামে বসন্তর ওই কৌশল দেখে শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলি বলেছিলেন বাংলা-দেশের খেলোয়াড়দের—"তোমরা সেকেণ্ড ডিফেন্স লাইন তৈরী কর।" ওরা সেই উপদেশ অনুযায়ী খেলে বসন্তর মত ভারতের অন্যতম সেরা কুশলী খেলোয়ড়কে বারংবার ধরে রাখে। ধরা পড়ে অধিনায়ক শেখর শেঠিও। আজকের খেলা দেখে মনে হল বাংলাদেশের যদি একজন ভাল হানাদার থাকত, তাহলেই ভারত ঘায়েল হত। শুধু তাই নয় এদিন তারা প্রথমার্ধে লোনা পেয়ে যখন ১৫—৯ পয়েণ্টে এগিয়েছিল, তখন রক্ষণাত্মক খেললে জয়ের মালা তাদের গলাতেই আসতো। কিন্তু দর্শকরা এত উৎসাহ দিচ্ছিলেন যে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এবং তাই-ই ওঁদের বিপর্যয় ডেকে আনে। তারা অতি মাত্রায় আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সাবধান হয়ে গেল ভারত। আর ঝুঁকি নয়। শেখর, সুভান্না, জয়দেব হানা দিয়ে পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে লাগল।

যখন নিজেদের ১০, তখনই বাংলাদেশ লোনা পেয়েছিল সহ অধিনায়ক সালেক হানাদার ধরায়। বিরতির আগে তারা ১৫—৯ এ এগিয়ে ছিল। তারপর তারা মাত্র একটি পয়েণ্ট সংগ্রহ করে সালেক হানাদার ধরায়। অপর পক্ষে ভারতের খেলোয়াড়রা হানা দিয়ে পায় ৮টি পয়েণ্ট ও বাকিগুলি হানাদার ধরে। বাংলাদেশের খেলো-য়াড়রা দুইবার কোল চড়াই স্পর্শ না করায়ও ভারত দুটি পয়েণ্ট পেল।

যশোহর স্টেডিয়ামের হাজার হাজার মানুষ উপভোগ করলেন খেলা। বাংলাদেশ দলের হার নিয়ে কাউকে সমালোচনা করতে দেখা গেল না। "ভারত অভিজ্ঞ তারা তো জিতবেই" বলতে লাগলেন দর্শকরা। তাঁরা নিজেদের খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিলেন, "আরও অনুশীলন করুন, টেকনিক রপ্ত করুন, ভারতের সঙ্গে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বেগ পেতে হবে না।”

কেউ কেউ এসে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন, “ফুটবল, হকি, ক্রিকেট বড়লোকের খেলা, অনেক টাকার দরকার। এই হাডুডু-তে তো মোটেই খরচ নেই। আপনারা এসে হাডুডুকে উচ্চাসন দিলেন। গ্রাম বাংলার এই খেলা এখন প্রসারিত হবে।”

খেলা শেষে অপেক্ষা করছিলাম স্টেড়িয়ামে। গোটা দশেক ছেলে, তাদের বয়স ১০ এর মধ্যে। দেখি একটু আগে টেষ্ট শেষ হওয়া কোর্টে খেলা শুরু করেছে। চিরপরিচিত হাডুডু-র বদলে ‘কবাডি কবাডি’ দম দিচ্ছে। স্টেডিয়ামের গা ঘেঁষে কয়েকটি কিশোর হকি-স্টিক হাতে ঘোরাঘুরি করছে। আমি এগিয়ে গেলাম। ছাল, চামড়া ওঠা স্টিক হাতে নিয়ে দেখি—‘মেড ইন পাকিস্তান।’ ওই কিশোরেরা আবদার জানালো ইচ্ছা থাকলেও খেলাধূলা করার উপায় নেই সরঞ্জামের অভাবে। পাকিস্তানী আমলে পশ্চিম থেকে সরঞ্জাম আসত। বাংলাদেশে সরঞ্জাম তৈরী হয় না। কালোবাজারে যা পাওয়া যাচ্ছে, তার দাম গগনচুম্বী। ওরা অনুরোধ করল, “আপনারা তো বন্ধু রাষ্ট্রের লোক আমাদের কিছু সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিন না।” আমি ওদের বললাম, “ভাই, তোমাদের সমস্যার কথা তোমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে বলব, আমাদের কাগজে লিখব, বলব আমাদের খেলাধূলার কর্তাদেরও।”

আনিসুর রহমান আর ডাঃ হুদা ডাকলেন প্যাভিলিয়ানের উপরে। এক রাউণ্ড চা খাওয়া হল। এরই মাঝে টেলিফোন এল অফিস ঘরে। ঢাকা থেকে বদিউজ্জামান ফোন করেছেন উদ্যোক্তাদের কাছে। খেলার বিস্তৃত বিবরণ চাইছেন। এম এ হামজা আমাকে এগিয়ে দিলেন। “মশায় আপনি যান, লাইনের কথা কন্ গে। রিপোর্ট টিপোর্ট আমরা বুঝি না।”

আমি তাঁকে পুরো ডিক্টেশন দিলাম। অনুরোধ করলাম, বাংলাদেশ

সংবাদ সংস্থা (বি এস এস) ও ইস্টার্ণ নিউজ এজেন্সীকে (এনা) খবরটি দিলে ভাল হয়। বি এস এস ভারতের পি টি আই ও এনা ইউ এন আইয়ের সঙ্গে কাজ করে। তারা খবর পাঠালে সারা ভারতের কাগজগুলো পাবে।

বদিউজ্জামান আমার অনুরোধ রেখেছিলেন।

আমি তাড়াতাড়ি ডাক বাংলোয় ফিরে খবর লিখলাম। তারপর ঢাকায় পাঠিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে সালভি এসে গিয়েছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা—অম্রূত কাহা। অর্থাৎ আবার ওর খেজুর রস চাই। আমি ডাঃ হুদার স্মরণাপন্ন হলাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন—সব ব্যবস্থাই আছে।

একটু পরে জাহীদ এসে কানে কানে শুনিয়ে গেলেন, আপনাদের জন্যি যশোরের কই-য়ের ব্যবস্থা হইছে। অচিন্ত্যদা যশোরের মানুষ, আপনি খুলনের—যশোরে আসলেন কই মাছ না খাইয়া ফিরে যাবেন এ হোতি পারে না! আমি সাইজটা জানতে চাইলাম। জাহীদ বললেন, বেশি বড় পাওয়া যায় নাই। মাত্র তিনডেতে একসের—এই রকম পাইছি।

ম্যানেজার জানিয়ে গেলেন, আজ সন্ধ্যায় কোথাও বের হবেন না। এখানেই জেলা ক্রীড়া সংস্থা ভারতীয় দলকে সংবর্ধনা জানাবেন। আপনাকেও নেমন্তন্ন করেছেন।

যশোহরে সেই সন্ধায় বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ডাঃ হুদাকে বললাম দাদা, আর কিছু না হোক 'অম্রূত' চাই। এখানকার সাঁঝের খেজুর রস আজও চাই এবং সকলের জন্যই। শাহীদুল ইসলামেরও একই কথা। ডাঃ হুদা বললেন, আমার জেলায় আইছেন যখন, মুখ ফুটুয়ে একবার যা কবেন তাই হবে। কোনোরম চক্ষু লজ্জা করবেন না।

সন্ধ্যার একটু পরেই আমাদের বাংলোর প্রাঙ্গণে তৈরী মঞ্চে এলেন পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব সোহরাব হোসেন। তাঁর সঙ্গে যশোহরের ডেপুটি কমিশনার ও বাংলাদেশের ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার

আহ্বায়ক কাজি আনিস্থুর রহমান। খেলেয়াড় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসন নিলেন বাংলোর লম্বা বারান্দার চেয়ারগুলোয়।

বাংলাদেশ কবাডির সম্পাদক জনাব হামজার পর আনিস্থুর রহমান বললেন, কবাডির প্রসারে এশীয় কনফেডারেশন গড়তে হবে এবং তার দায়িত্ব যুগ্মভাবে নিতে হবে ভারত ও বাংলাদেশকেই। তিনি জানান, মরিসাস, সিংহল, বর্মাতে আগে কবাডির প্রচার করতে হবে। যেতে হবে এশিয়ার অন্যান্য দেশেও। এবং সাতটি দেশ অংশ নিতে চাইলে এশিয়ান গেমসের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হবে কবাডিকে।

মন্ত্রী সোহ্‌রাব হোসেন বললেন, কবাডি বাংলাদেশের নিজস্ব খেলা হলেও গত ২৫ বছর ধরে বিজ্ঞান সম্মতভাবে কবাডির চর্চা হচ্ছে ভারতে। আজ বন্ধু রাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা স্বাধীন বাংলাদেশে এসে তার আধুনিক রূপ দেখালেন, এর দ্বারা দুই দেশের মৈত্রী দৃঢ় হবে। এবং পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের খেলোয়াড়রাও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। সরকার যাতে এই খেলার প্রসারে আরও সাহায্য করতে পারে তিনি সে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দুই দলের খেলোয়াড় ও অন্যান্যদের যশোহরের স্মৃতি চিহ্নরূপে 'রূপোর খেজুর গাছে রূপোর ভাঁড় ঝোলানো' প্রতীক উপহার দেওয়া হল। ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনার উত্তর দিলেন শেফ-দ্য-মিশন শ্রী এস এল সালভি।

এরপর সকলকে নৈশ ভোজে আপ্যায়ন করা হল। ভোজ শেষে একে একে সকলে চলে গেলেন। রইলাম শুধু আমরা। সালভিকে দেখলাম খেয়েই সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছেন।

—কী ব্যপোর ক্লান্ত নাকি!

—আজ বহুৎ খিলায়া।

—গতকাল আপনার খাওয়াটা ঠিক হয়নি, আজ তার শোধ দিলেন বোধ হয়।

—আরে ই আদমী এৎনা খিলাতা কেও?

—শিবাজীর দেশের লোক সালভি তোম্ তো জানতা নেহী এ কোন্ দেশ হ্যায়। ক্যায়সা দেশ হ্যায়। খাওয়া নিয়ে এদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করেছ কী মরেছ, দেখলে না গতকাল কই মাছের কথা তুলতেই এমন মাছ আনলেন যে তিনটিতে এক কিলো হচ্ছে! আজ থেকে খাওয়া কন্ট্রোল করতে হবে। কিংবা খেলোয়াড়দের সঙ্গে রোজ ভোরে উঠে ফিটনেসের ব্যায়াম করতে হবে।

খেয়ে অস্বস্তি বোধ করছেন, তবুও ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল: আরে রিপোর্টার, হামারা অম্রুত কাহা।

—ডাঃ হুদা ব্যবস্থা করছেন।

—ও অম্রুত পিনেকা বাদ সব ডাইজেস্ট হো যায়গা।

খেজুর রসের কথা শুনে আমাদের সব খেলোয়াড় রয়ে গেল। এ ব্যাপারে ওদের নেতা নিশাকর এবং ডেপুটি জয়দেব। সুভান্না, বসন্ত এই ক'দিনেই বাংলা শিখে গেছে। বড় বড় হরফের বাংলা সাইনবোর্ড পড়ছিল। ওরা দুজন বলছিল: খাজুর রস খুব ভালো। আজ আমরা খাবে তো! প্রত্যেকেই দেখলাম ভরপেট ডিনারের পরেও এক বা দুই গ্লাস রসে ক্ষান্ত হচ্ছে না। তিন, কেউবা চার-এ শেষ করছে। নিশাকর ও সালভি পাঁচ গ্লাসে ইতি টানলেন। কোচ ওয়ালঞ্জ চার-এ উঠলেন।

রাত তখন সাড়ে দশটা। তাড়াতাড়ি ঘুমুতে হবে। কেননা আগামীকাল ভোর সাড়ে ছটায় আবার যাত্রা। গন্তব্যস্থল খুলনার মঙ্গলা বন্দর। যশোহর থেকে বাসে খুলনা ৩০ মাইলের উপর। সেখান থেকে লঞ্চে মঙ্গলা যেতে হবে। সমস্যা দেখা দিল বাসের প্রসঙ্গ উঠতেই। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণে তখন ধর্মঘট চলছে। সুতরাং যাবো কিসে। ডাঃ হুদা বার চারেক টেলিফোনের রিসিভার তুলে সমস্যার সমাধান করে ফেললেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি

ভোরের পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। তখন সাড়ে পাঁচটা বাংলাদেশ সময়। অর্থাৎ আমাদের পাঁচটা। এই শীতেই কেউ কেউ স্নান সেরে নিলেন। সারাদিন স্নানের সম্ভাবনা নেই জেনে আমিও কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে গোছল সারলাম। তারপর প্রস্তুত হলাম। চা খেয়ে বসে রইলাম। সকলেই এলেন আমাদের বাংলোয়। সাড়ে ছটা বেজে গেল, কিন্তু বাস এল না। সাতটায়ও না। এল তারও আধ ঘণ্টা পরে। সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্যই বাংলাদেশ বিমান-এর বাস আসতে দেরী করল। আমরা ঝটপট উঠে পড়লাম। আজকের অভিভাবক শাহীদুল ইসলাম ও তাঁর সহোদর জাহীদুল।

মাইকেল মধুসূদন কলেজ, বাজার ইত্যাদি অতিক্রম করে বাস ছুটে চলল খুলনার দিকে। রাস্তার দুধারে মাঠের মধ্যে অসংখ্য খেজুর গাছ—যশোহরের বৈশিষ্ট্য। সালভি গাছ দেখে অবাক। তাঁর বক্তব্য এই কাঠখোট্টা গাছে অমৃতের মত অত সুমিষ্ট রস হতে পারে?

নাম মনে পড়ছে না। বাসে হঠাৎ দেখা খুলনার এক তরুণের সঙ্গে। সে দুধারের ক্ষত বিক্ষত অসংখ্য বাড়ি দেখিয়ে বলল, এইসব যুদ্ধের চিহ্ন। টেলিফোনের ক্রশবার ঘেঁসে মোটা রবারে মোড়া লাইন দেখিয়ে জানাল, ইনডিয়ান মিলিটারি এসেই ফোনের জন্য ওটি টেনেছিল, পাক মিলিটারি পুরনো কানেকশন কেটে দেওয়ায়।

ট্রেন লাইনের ধার দিয়েই বাস রাস্তা তাই বহু পরিচিত সেই স্টেশনগুলো চোখে পড়তে লাগল। মনে পড়ছিল ফেলে আসা দিনগুলির কথা। বাল্যে, কৈশোরে কতবার খুলনা থেকে কলকাতা এই রেল লাইন দিয়েই গিয়েছি বরিশাল এক্সপ্রেসে চড়ে। যাতায়াত করেছি ১৯৪৭-এর পরে কত অসংখ্যবার। সব কিছুই স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। শিঙ্গিয়া স্টেশন আমাদের কাছে শিঙে, নওয়াপাড়া ছিল

নপাড়া। এইসব স্টেশনের ধারে তখন দু একটি রেল কোয়ার্টার ছিল। কাছাকাছি পাকাবাড়ি চোখে পড়ত কদাচিৎ। কিন্তু এখন প্রত্যেকটি স্টেশনের অনতিদূরে ছোটখাটো শহরের পত্তন হয়েছে। বিজলীবাতি এসেছে। বিলিতি সিগারেট, কোকাকোলা, দোকানে দোকানে ট্রাঞ্জিসটর, একটু সম্পন্ন গৃহে টেলিভিসন। ভাবতেও অবাক লাগে! আর তখন গাঁ থেকে আমাদের শহর খুলনায় এলেই চাউর হত খুলনে গেছে। আর যখন কলকাতায় এলাম। তখন বছরে একবার বা দু বছরে একবার গাঁয়ে ফিরলে সেকী কদর, আদর! যেন বিলেত থেকে ফিরেছি!

ফুলতলার পর দৌলতপুর অতিক্রম করলাম। কিন্তু দৌলতপুরের সেই চিরপরিচিত কলেজ চোখে পড়ল না। কারণ বাস রাস্তা অন্য দিক দিয়ে ঘুরে গিয়েছে। তবে দূর থোক নিউজপ্রিণ্টের কারখানা দেখলাম। শাহীতুল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করলাম—'প্রেম কানন' আছে তো? কাছে এলে দেখাবেন। বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতা আসার পথে বাঁদিকে 'প্রেম কানন' দেখতাম। চমৎকার ফুলের বাগান। নানারকম গাছ কাঁচি দিয়ে কেটে হাতী, ঘোড়া, উট বানানো হত।

শাহীতুল ভাই জানালেন, না সেই প্রেম কাননের কোনো চিহ্নই এখন নেই। রেল লাইনের ধার দিয়ে বাসে যেতে যেতে দেখলাম রেল ট্রাকে পাথর নেই। শুধু স্লিপারের উপর রেল বসানো। বাংলাদেশের ট্রেন সম্পর্কে খোঁজ নিলাম, এখনও রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। অধিকাংশ গাড়িই লেটে রান করে। তবুও প্রচণ্ড ভিড়। প্রতিটি গাড়ির ছাদে শত শত যাত্রী যাতায়াত করেন। নদী বহুল বাংলাদেশে নদী পরিবহন ব্যবস্থা মাঝে খুব উন্নত হলেও এখন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে। ডিজেল, পেট্রোল, কয়লা এবং সরঞ্জাম ইত্যাদি এর নানা কারণ হলেও অন্যতম বাধা নদীগুলি মজে যাওয়া। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপ বেড়েছে রেলে। ইতি মধ্যে সড়ক

পরিবহনে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়েছে। সর্বত্র নদীর উপর এখন মোটর চালিত আধুনিক ফেরি সার্ভিস রয়েছে, বেসরকারী বাস তো রয়েছেই। মুক্তি যুদ্ধের পর সরকারী বাস—বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা ভারত থেকে টাটার তৈরী ডিজেল চালিত বাস চালাচ্ছেন সর্বত্র। অরডিনারি ছাড়াও এক্সপ্রেস সার্ভিস যাত্রীদের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছেন।

পথি মধ্যে আমাদের বাস থেমে গেল কিছু ব্যক্তির অবরোধে। বাইরে তাকিয়ে দেখি বাংলাদেশ বিমানের আর একটি বাস আমাদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। সরকারী ও বেসরকারী বাস ধর্মঘট। এদিকে বাংলাদেশ বিমানের যে বাস খুলনা থেকে ভোরে রওনা হয়েছিল যশোরের উদ্দেশ্যে বিমানযাত্রীদের নিয়ে তারা আটক হয়ে পড়েছেন বিমান-বাস খারাপ হওয়ায়। নির্দিষ্ট বিমান ধরার আর আশা নেই, কিছু যাত্রী তাই আবার খুলনায় ফিরতে চান। আমাদের বাসে কয়েকটি আসন খালি ছিল। কিন্তু তার তুলনায় বিকল বাসের যাত্রী এলেন অনেক বেশি। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেককে যেতে হল। তবে মহিলা ও শিশুদের জায়গা ছেড়ে দিল দুই দলের কবাডি খেলোয়াড়রা।

দৌলতপুর ও দৌলতপুর কলেজ স্টেশন অতিক্রম করে দেড়ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের বাস খুলনা স্টেশনের কাছে এল। বহুদিন পর পুরনো সেই স্টেশন, প্ল্যাটফর্মের ধারের পুকুর ইত্যাদি দেখে নানা স্মৃতি জাগছিল। বাল্যে, কৈশোরে মাসতুতো ভাই ও দাদাদের সঙ্গে এই স্টেশনে এসে কত সময় কাটিয়েছি। তখন হবি ছিল সিগারেটের প্যাকেট জমানোর। ইঞ্জিনের পুঁ-উ-উ ও কু ঝিক ঝিক শব্দ কেমন যেন রোমাঞ্চ জাগাত! বেশ মনে আছে 'উল্লাসিনীতে' মাঝে মাঝে কলকাতার বড় বড় আর্টিস্টদের নিয়ে থিয়েটার হত। আর আমরা সেই আর্টিস্টদের

দেখতে এই খুলনা স্টেশনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। একবার ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য আর চন্দ্রাবতী দেবীকে দেখার জন্য আমরা রাত দশটা অবধি অপেক্ষা করে তাঁদের দেখে যখন মাসীর বাড়ি ফিরছিলাম, তখন আমরা সকলে ত্যাজ্য হবার উপক্রম।

একটু বড় হয়ে কলকাতার বাসিন্দা হয়েছি। ছুটি কাটাতে আসতাম এই খুলনায়। এখন আমি ভারতের নাগরিক। তবু বাসের সকলের উদ্দেশ্যে বললাম, আমার জেলায় আইছেন। কিছু মনে করবেন না। আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দোষত্রুটির জন্যি। প্রায় একই কথা বললেন অচিন্ত্যবাবু: আমারও বক্তব্য আছে এডা শ্বশুর বাড়ির দেশ।

স্টেশনের ধার ঘেষে ট্রেন লাইন অতিক্রম করে কাছেই স্টীমারঘাটে পৌছলাম। তখন প্রায় দশটা। এই স্টীমার ঘাটে আগে সকালে প্রচণ্ড ভিড় দেখেছি। ভোরের পরেই বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্দেশ্যে (বরিশাল, ঢাকা, সাতক্ষীরা প্রভৃতি) স্টীমার ছাড়ত। গারো, শিউলি, ডিকো আরও কত-নাম মনে পড়ছে না। ভোর বেলায় আর ছিল লোকের হুড়োহুড়ি। খুলনা থেকে ৩০ বা ৫০ মাইলের মধ্যে নদী পথে যাতায়াত করতে লঞ্চ সার্ভিস জনসাধারণকে নৌকো, পানসি বা গহনার বদলে অনেক দ্রুততা এনে দেয়। স্টীমার এদিক ওদিক দু চারটে চোখে পড়ল, দেখলাম লঞ্চও। কিন্তু খুলনা ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার্স কে তেমন প্রাণচঞ্চল মনে হল না। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়া। ভৈরব, নদীতেও আগের মতঁ স্রোত নেই। টাবুরে নৌকোও কমেছে মনে হল।

আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল বাংলাদেশ পর্যটন বিভাগের মোটর লঞ্চ—এম এল মুকুল। ওর ভিতরে ৫০ জনেরও বেশি লোকের বসার জায়গা। কাঁচের জানালা চতুর্দিকে। স্নান আহারের সবকিছু

আধুনিক বন্দোবস্ত। ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার পক্ষ থেকে অবশ্য প্যাকেট ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। শাহীতুল ইসলাম স্টীমার ঘাট থেকে শ'খানেক ডাব, কুল আর শাক আলু কিনলেন। ডজন কয়েক সবরি কলাও কেনা হল।

লঞ্চ স্টার্ট' নিল। গন্তব্যস্থান—সুন্দরবন। কিন্তু সারেং জানালেন—সুন্দরবনে এখন যাওয়া নিষেধ। কারণ ওখানে নাকি উগ্রপন্থী ও রাজাকরদের আস্তানা। সব রকম আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে ওরা সজ্জিত। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী এদের ঘিরে রেখেছে। মাঝে মাঝে সম্মুখ সমরও হচ্ছে। শুনলাম ওই রাজাকর উগ্রপন্থীরা রাতের আঁধারে স্পিডবোট নিয়ে লোকালয়ে গিয়ে ডাকাতি করে।

'এম এল সুকুলের' ছাদে উঠে দেখছিলাম—খুলনার পুরণো কিছু দেখা যায় কিনা। রূপসার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ডান দিকে নদীর ধারে কালীবাডির সেই বটগাছ নেই। শুনলাম কালীবাড়ি ভৈরব গ্রাস করে নিয়েছে। কিছুটা এগোতেই বাঁদিকে রূপসা রেল স্টেশন। রূপসাও কেমন যেন ঠাণ্ডা। আগের মত প্রাণচাঞ্চল্য নেই। তবে রূপসা থেকে বাগেরহাট পর্যন্ত ট্রেন চলাচল যথারীতি করছে। ডাইনে খুলনা শিপইয়ার্ড। ওর ধারেই অর্ধেক ডুবন্ত একটি জাহাজ। গত যুদ্ধের সময় ভারতীয় বিমানবাহিনীর বোমায় ওটি ডুবেছিল।

যুদ্ধের কথা উঠতেই বুড়ো সারেং জানালেন—তখন এই সুকুলও আর পর্যটকদের প্রমোদ ভ্রমণে ব্যবহৃত হত না। ছাদে ও ছাদের রেলিং-এ কোথায় কোথায় মেশিনগান বসিয়েছিল খান সেনারা তাও তিনি দেখালেন। বললেন, কী সুন্দর ছিল লঞ্চটি! সব নষ্ট করেছে পশ্চিমারা।

নদীতে তখন জোয়ার শুরু হয়েছে। স্রোত আমাদের বিপরীত। অর্থাৎ উজান বেয়ে আমাদের লঞ্চ চলেছে। গতি তাই কম। ঘণ্টায় আট নটিকাল মাইল। আগে এর গতি দশ ছিল।

লঞ্চের ছাদে চেয়ার পেতে নুন সহযোগে টক টোপা কুল (খুলনার ভাষায় 'বরোই') খেতে খেতে নানা সুরে গান চলছিল। বাংলদেশের খেলোয়াড়রা পল্লীগীতি ধরল। আমাদের কেউ কেউ হিন্দী। নিশাকর বাংলা গানের দুই এক কলি গেয়ে তার সঙ্গে স্বরচিত লাইন জুড়ছিল এমনভাবে যে ধরার উপায় ছিল না। গানের চাইতে জমল তার গল্প।

নিশাকর বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের শোনাচ্ছিল ওর যেখানে বাড়ি সেই চন্দননগর কী কী কারণে বিখ্যাত। বলল : চন্দননগর কয়েক বছর আগেও ছিল ফরাসী অধিকৃত। এখনও জগদ্ধাত্রী পূজো বলতে পয়লা। কবাডিও খুব জনপ্রিয়। অচিন্ত্যবাবুর মন্তব্য : কবাডিতে চন্দননগরের ভোলা গুঁই নাম্বার ওয়ান। নিশাকর তখন আপত্তি তুলেও থেমে গেল। সে বলল : গুরু যদি বলে আমার চাইতে ভোলা বড় প্লেয়ার তো আমার বলার কিছু নেই। আমি ঠাট্টা করে বললাম : নেতা বলতেও চন্দননগরে তিনজন। এই তিনজনের মধ্যে তৃতীয় নিশাকর।

নিশাকরের জিজ্ঞাসা : ফাস্ট´, সেকেণ্ড কে কে ?

—ফাস্ট´ রাম চ্যাটার্জী, সেকেণ্ড ভোলা।

নিশাকর কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করতে রাজি নয়। সে বলল, ওরা জীবনে অনেকবার জেল খেটেছে। আমিও অ্যারেষ্ট হয়েছি। কিন্তু ইংরেজ বা এখনকার পুলিশ জেল খাটাতে পারেনি। অবশ্যি দিনের পর দিন হাজতে ছিলাম। এবার বলুন ফার্ষ্ট´ কে ? তবে কি জানেন ? চন্দননগরে গিয়ে এখন কোনো বিপদে পড়লে আমার নাম করবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু কখনও নিশাকর বলবেন না। বলবেন, কাব্‌লের লোক। ব্যস !

কাব্‌লে বাবু এবার গল্প শুরু করলেন, ছোট বেলাকার গল্প।

তখন আমি বেকার। কিন্তু বন্ধুরা ফিষ্টি করবে। আমি বললাম, আমার তো টাকা নেই। ওরা বলল, ওসব অজুহাত চলবে না।

গঙ্গায় লঞ্চে আগামী রবিবার ফিষ্টি হবে। বুধবার কেটে বৃহস্পতি বার এল, কিছুতেই টাকার জোগাড় হল না। এল শুক্রবার। গরমকাল। জি টি রোডের পিচ গলে গেছে। এরই মাঝে দু একটা গাড়ি যাচ্ছে আসছে। আমরা চার বন্ধু মিলে বটগাছের নীচে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ বড় একটা ডজ গাড়ির ব্রেক চাপার শব্দ। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেখি—এক সাহেবের গাড়ি বিড়াল চাপা দিয়েছে। আমরা গাড়ি আটকে দিলুম। এক বন্ধু কপালে হাত দিয়ে কান্না কাটি করতে লাগল—তার পোষা বিড়াল চাপা পড়েছে। সাহেব ডানলপের ম্যানেজার। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, ব্যাপার কী ? আমি বললাম, 'ক্যাট ইজ গান ফট্ অর্থাৎ বিড়াল মরে গেছে। ওই যে ছেলেটি কাঁদছে। ওর পোষা ছিল। সাহেব তিন চার বার 'সরি সরি' বলল। আমি বললুম, যা হবার হয়েছে সাহেব। সমস্যা হল বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। চার চারটে দুধের বাচ্চা, কী খাবে ওরা। সাহেব একটু ভেবে মানিব্যাগ থেকে ৫ খানা ১০ টাকার নোট বার করে আমাকে দিয়ে বললেন ঃ তুমি দুধ কিনে দিও। আমি ধরা গলায় 'তাই হবে, তাই হবে' বলতে বন্ধুকে ডেকে নিয়ে রাস্তার ধারে এলাম। ততক্ষণে গাড়ি অনেক দূরে এগিয়েছ। প্রশ্ন জাগল, বিড়ালটা কী সত্যিই মরেছে ? রাস্তার মাঝে গিয়ে লেজটা তুলতেই দেখি সেটি হুলো বিড়াল।

বাংলাদেশের সহ অধিনায়ক জিজ্ঞাসা করল ঃ চন্দননগরের হুলো বিড়ালদের বাচ্চা হয় ?

নিশাকর ঃ বেকার ছেলে। ফিষ্টি করতে গেলে ওরকম কত কী করতে হত ! তবে আমরা কাউকে কখনও জুলুম করতুম না।

নিশাকরের হুলো বিড়ালের গল্প শুনে সকলেই হাসতে লাগল। কিন্তু ওই গল্পের চাইতে ভারতীয়রা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল বুড়ো সারেংএর মুখে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী। কীভাবে বাংলাদেশের হাজার হাজার তাজা প্রাণ আত্মবলি দিয়েছিল পশ্চিমাদের

নাগপাশে থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। শুনছিল তারা—কীভাবে ভারতীয় সৈন্যরা সেই যুদ্ধে সাহায্য করেছিল।

লঞ্চের ছাদে কিছু ছবি তোলা হল! কেউ কেউ গান ধরেছিল

নদীর এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে
এই তো নদীর খেলা……

আমার মনে পড়ছিল বাল্যের ও কৈশোরের নানা রঙের দিনগুলির কথা। তখনও স্টীমার চালু হয়নি এ অঞ্চলে। গাঁয়ের বাড়ি থেকে গহনা নৌকোয় শহরে আসতাম। প্রতিটি স্টেশনে গহনা নৌকো পৌঁছবার আগে ও সেখান থেকে ছাড়বার সময় ডিং ডিং ডিং করে তবলার উপর পাতলা বেতের লাঠি দিয়ে বাজানো হত। কখনও আমরা পানসি নৌকোয় আসতাম। তারপর হল স্টীমার। চলত ঘণ্টায় পাঁচ নটিক্যাল মাইল। 'শিউলি' 'ডিকো' কত স্টীমার ছিল! তবে 'শিউলি' পেট্রোলে চলত। স্পীডও ছিল খুব। পরবর্তী কালে হয়েছিল লঞ্চ। এখনও লঞ্চের যুগ।

তবে বহুদিন পরে জন্মভূমিতে এসে দেখি বহু পরিবর্তন হয়েছে। খুলনা ছেড়ে, জলমা পার হয়ে, আমরা কাতেনাংলার কাছে। অদ্ভুত লাগছিল সব। ডানদিকে বিরাট রাস্তা সোজা চলেছে দক্ষিণে। ওয়াপদার রাস্তা এটি। ছোট বড় খাল বা অনেক নদীও বাঁধা হয়ে গেছে। তার উপর হয় কালভার্ট, কিংবা ব্রীজ। তবে দু একটি বড় নদীতে ব্রীজ হয়নি। সরকার মংলা পর্যন্ত ওই রাস্তা নিয়েছেন। শুনলাম ওই পথে নাকি খুলনা থেকে রেল লাইন হবে।

আরও এগিয়ে চললাম। ডাইনে নদীর ধারে অসংখ্য ভিড়। মনে হচ্ছে গঞ্জ। আজ বুধবার। মনে পড়ল ওই দিনই চালনার হাট বসে। ভদ্রা নদী চোখে পড়ল, আর সামনে বিরাট পশর (বা পুশুর) নদী। চালনার হাট আগে ভদ্রার ধারে চুণকুড়ির বিপরীত দিকে বসত। এখন সে অনেক পূবে সরে এসেছে। এই ভদ্রা ও পশরের সংযোগ স্থলেই শুরুতে চালনা বন্দর ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী আমলেই নানা

বিচার বিবেচনা করে চালনা থেকে বন্দর সরিয়ে মংলায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পশর বর্ষায় ফুঁসে ফেঁপে ওঠে। ফেবরুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে তাই মোটামুটি শান্তই ছিল। লঞ্চের উপর থেকে নদীর দুই তীরে ধূ-ধূ মাঠ দেখছিলাম। খুলনা জেলার এতদঞ্চলে একটি ফসল হয়—সেটি আমন ধান। অন্য সময়ে জমিতে চাষ হয় না—লোনার জন্য। পরীক্ষা করেছিলাম এতদিনে নদী তার রূপ বদলেছে কিনা—নদীর জল চোখে দিতেই জ্বালা করছিল। মুখে দিলাম—ভীষণ তিতো।

আরও এগোতে ডানদিকে দেখলাম বাজুয়ার হাট। আগের চাইতে দালানকোঠা বেড়েছে। বাজুয়া খালের উপরে ব্রীজও হয়েছে। আর খুলনা থেকে চলে আসা ওয়াপদা-র রাস্তা মংলার দিকে যাওয়ার সুবিধা করে দিয়েছে। আমাদের লঞ্চ নদীর বাম তীর ঘেঁষে এগোচ্ছিল। এবার তীরের উপরে বড় বড় লোহার চাংড়া দেখলাম। বুঝতে অসুবিধা হল না এসব জাহাজেরই অংশ। সারেং জানালেন, গত যুদ্ধের সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে এখানে জাহাজ ডোবে ও পরে তা তোলা হয়। আর একটু যেতেই আরও একটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম।

আমরা মংলার কাছাকাছি এসেছি তা বোঝা গেল। দূরে বড় বড় জাহাজের দর্শন পেলাম। বাঁ তীরে বড় বড় ক্রেন, বুল ডজার ইত্যাদি দেখলাম। নদীর ভিতরে পাইলিং হচ্ছে। সাইনবোর্ড দেখে জানলাম যুগোশ্লোভিয়ার একটি সংস্থা ওখানে শিপাইয়ার্ড তৈরীর প্রাথমিক কাজ করছে দ্রুত গতিতে। পশর ধরে একটু যেতেই মংলা নদী বাঁদিকে। এই মংলা আর পশরের সংযোগ স্থলেই মংলা বন্দর। বন্দরকে কেন্দ্র করে ছোট শহর গড়ে উঠেছে। লঞ্চ, নৌকো, গাদাবোট, ষ্টীমার, জাহাজ সবকিছুর ভিড়। লঞ্চ থামতেই আমরা উপরে উঠলাম। ছোট্ট শহর, পীচের রাস্তা, বিজলী বাতি আছে, আছে ট্যাপওয়াটার, টেলিফোন। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ি অফিসারদের বা ভি আই পি দের

জন্য। আছে আধুনিক হোটেল, রেস্তোরাঁ। বাংলাদেশে বার দেখেছি ইতিপূর্বে ঢাকার ইণ্টার কন্টিনেণ্টাল ও পূর্বাণী হোটেলে এবং তেজগাঁও বিমান বন্দরে, তারপর এই দেখলাম। সারা বাংলাদেশে মদ্যবর্জন নীতি চালু হয়েছে স্বাধীনতার পর। তবে দু একটি জায়গায় বিদেশীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাও পাকিস্তানী আমলের চাইতে পাঁচ বা ছয়গুণ বেশি দামে বিক্রি হয়—যাতে সাধারণ মানুষ মদ স্পর্শ করতে না পারে। গরিব দেশ, তাই বাংলাদেশ সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। প্রশংসণীয় বৈকি!

বাংলাদেশ টেলিফোনের ডিরেক্টর তথা অ্যামেচার অ্যাথলেটিক সংস্থার সম্পাদক শাহীদুল ইসলাম তো সঙ্গেই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনাদের ঢাকা অফিসের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান? সম্প্রতি এখানে মাইক্রোওয়েভ চালু হয়েছে।

ওঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাহিদুল ঢাকার জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার। পূর্বালী ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকের শাখা দেখে ভাবলাম জনতা ব্যাংকও নিশ্চয়ই মংলায় আছে। পেলামও। জাহীদ সেখানে ম্যানেজারে কাছে গিয়ে পরিচয় দিতেই আটকে গেলেন। তিনি খাওয়াবেনই। জাহীদ জানালেন, আমরা জনা পঞ্চাশেক আছি, তুমিই বিপদে পড়বে—এত দ্রুত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে মংলাতেও শ্রমিক বিক্ষোভ আছে মনে হল পোস্টার দেখে। 'বে-আইনী লেঅফ চলবে না'। 'লোনা ভাতা দিতে হবে' ইত্যাদি। সেদিনই ওখানে শ্রমিক বাছাই হচ্ছিল ইণ্টারভ্যুর মাধ্যমে।

বন্দরের দোকানগুলিতে হরেক রকম বিদেশী জিনিস আছে। সিগারেট, ব্লেড, টিনফুড, ভ্যাট-৬৯ও। বিদেশী নানা কাপড়ও পেলাম। তবে সবই লুকিয়ে বিক্রি হয়, আর দু চারটি বন্দর ও শহরের মতই। কী খেয়াল হল জানিনা—রাস্তার ধারের একটি আধুনিক হোটেলের বন্ধ দুয়ারে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেই দেখি মেম সাহেবরা বসে

কাটা চামচে লাঞ্চ করছেন। ভাবতেও অবাক লাগছে পনের বা কুড়ি বছর আগে এখানে জনপ্রাণী ছিল না। শুধু মাঠ—আমন উঠে গেলে। আর এখন এই জায়গাটা বাংলাদেশের বৃহত্তম বন্দর।

সময় কম। আজই খুলনা হয়ে যশোহরে যেতে হবে। শাহীদুল ইসলাম তাগাদা দিলেন—'ফ্রেণ্ডস লেট আস মুভ.।' আমরা লঞ্চের দিকে ফিরলাম। ওই ফাঁকে উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকাতেই সেই পরিচিত সুন্দরবন দেখলাম। প্রকৃতিদেবী যেন প্রতিটি গাছের মাথা বড় কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছেন। সব গাছের উচ্চতা তাই যেন এক!

যে পথে আমরা মংলা এসেছিলাম খুলনা থেকে, সেই পথে ফিরে চললাম খুলনার দিকে। স্রোত অনুকুল, তাই আমাদের গতিও কিছুটা দ্রুত। সকালে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছিল প্যাকেটে। দুপুরে লাঞ্চও প্যাকেটে। চিকেন রোস্ট, স্যাণ্ডউইচ, আলু কপির তরকারি, সবরী কলা, সন্দেশ এবং সবশেষে দুটি করে বড় বড় ডাব। লঞ্চের জানালার ধারে মাথা এলিয়ে দিলাম সকলেই। শেষ শীতের পড়ন্ত রোদ আর স্রোতস্বিনী নদীর ঝিরঝিরে উষ্ণ হাওয়া অধিকাংশের চোখে নিদ্রা এনে দিল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? এতদঞ্চলে সাধারণত বিকেলের দিকে হাট জমে। তাই ফিরতি পথে চালনার দিকে তাকলাম। না, চালনা ঠিকই আছে। বিকালে অগনিত মানুষের ভিড়, এসেছে ছোটবড় নৌকো। আমাদের লঞ্চের গা ঘেঁষে হাটফিরতি যাত্রীদের দেখলাম। সাপ্তাহিক সওদা নিয়ে তারা বাড়ি ফিরছেন।

দু'খানি নৌকো একটু ব্যবধান রেখে চলছিল! কিন্তু দুই নৌকোর লোকেদের চিৎকার কানে আসছিল। একটি নৌকোয় চমৎকার চেহারার একটি বাছুর দেখলাম। গলায় ঘণ্টা বাঁধা। তার মাথায় হাত দিয়ে পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তি আদর করছেন। বুঝতে বাকি

রইল না হাট থেকে কিনেছেন। অপর নৌকোর জনৈকের চীৎকার—কী বজলুর চাচা, এডা কিনলেন মনে হতিছে।

—কেনলাম খালেক। বেশ সারন্ত মনে হতেছে। দেহি খাওয়ায় পরায় বড় করতি পারি যদি। বড় মায়েডার বিয়ে দেব। ভাবদিছি জামাইডারে দেব। বয়না (বক্‌না) বাছুর।

আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করছিলাম—খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে নদীগুলির আর খরস্রোতা গতি নেই। সবগুলিই কেমন যেন শান্ত, নিস্তেজ। জিজ্ঞাসা করলাম বজলুর চাচার নাম ধরে গলা ফাটিয়ে নিজের পরিচয় নিয়ে—ভারত থেকে আইছি। অনেকদিন আগে আইছিলাম। তখন তো গাং গুলোর চেহারা এমন ছিল না। এহন সোত্‌ টোত্‌ নেই কেন?

বজলুর চাচা বললেন, সায়েব ওয়াপদার বান্ধে গাংগুলো মরে গেছে।

আবার কাতেনাংলা, আবার জলমা পেরিয়ে রূপসার দিকে এগিয়ে চলেছি। সন্ধ্যার আগে খুলনায় ফিরতেই হবে। কেননা, আমাদের লঞ্চে সার্চ লাইট নেই, অন্ধকারে চলা যাবে না। খুলনায় পৌঁছলামও সন্ধ্যার আগে—ঠিক পৌন পাঁচটায়। কিন্তু তার আগে শাহীদুল ইসলামের নির্দেশে আর এক প্রস্থ খাবার এল। এবার চা ও জলখাবার। ভরা পেটে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখে ঠেকাতে হল। কেননা শেফ-দ্য মিশন সালভি 'না' করতেই বাংলাদেশ দলের কোচ সাহেব আলি সেন্টিমেণ্টাল কথা বলেছিলেন—আপনারা বড় দেশের মানুষ, গরিব বাংলাদেশের খাবার বোধহয় পছন্দ হচ্ছে না।

বাংলাদেশ বিমানের সেই বাস আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। বাসে জায়গা নিয়ে নেমে এলাম খবরের কাগজ কিনতে। পেলাম শুধু 'ইত্তেফাক'। গতকালের যশোর টেঃষ্টব খবর বেরিয়েছে। তাছাড়া আমাদের আনন্দবাজারে যেমন প্রতি মঙ্গলবারে খেলার বিশেষ পৃষ্ঠা

থাকে, তেমনি ওদেরও প্রতি বুধবারে 'মাঠে ময়দানে'। পুরো পাতা কবাডি নিয়ে রচনা ও ছবিতে পূর্ণ।

বাসে উঠে শাহীদুল ইসলামকে বললাম, দাদা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তো এলাম। পুরনো শহরটা একটু ঘুরতে চাই। বাস বাজারে ধার দিয়ে থানার পাশ ধরে এগিয়ে চলল। ডাইনে সেই পুরনো গান্ধী পার্ক। রোজ বিকেলে আমরা আসতাম বেড়াতে পার্কের মাঝে ছোট একতলা আচ্ছাদন ছিল তার উপর থেকে গান আর খবর শুনতাম। রেডিওর সঙ্গে লাউডস্পীকার লাগিয়ে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ ওই ব্যবস্থা করেছিলেন। বছর পনের আগে প্রতিদিন বিকালে ওই আচ্ছাদনের নীচে বসতেন আমাদের কবিদাদু শিশু সাহিত্যিক শেখ হবিবুর রহমান। মজার মজার গল্প শোনাতেন তিনি।

বাস এগিয়ে চলল বড় মাঠের দিকে। বাল্যে এখানকার ফুটবল খেলা ছিল আমার কাছে বিশ্বশ্রেষ্ঠ। আমার প্রিয় দল ছিল টাউন ক্লাব। আর সেই দলে খেলতেন দেবু ঘোষ (এখন তিনি কলকাতার বি এন আর দলের কর্মকর্তা, বহুদিন ছিলেন কোচ)। ভাবতাম, আহা অমন খেলোয়াড় যদি হতাম। ওই মাঠে একবার ইউনিয়ন স্পোর্টিং-এর একজন দেবু ঘোষকে ঘুষি মারলে তাঁর কপাল কেটে রক্ত পড়তে থাকে। দেবু ঘোষের জন্য সে রাত্রে আমার ঘুম হয়নি।

সেই মাঠে তারপর স্টেডিয়াম হয়েছে। এখন আরও বড় হচ্ছে স্টেডিয়াম। জেলা স্কুলের রাস্তা ধরে আমরা মাঠ অতিক্রম করে মডেল স্কুলকে বাঁ দিকে রেখে বি দে রোডে পড়লাম। তারপর উত্তর মুখো আমাদের বাস। খুলনা এখন ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার, অনেক বড় বড় বাড়ি উঠেছে। জনসংখ্যাও বেড়েছে, অফিস কাছারিও।

হঠাৎ একজন কিশোর এসে আমাদের গতিরোধ করে দিল। বাস থামল। উচ্চকণ্ঠে শুনলাম—চাঁদা না দিয়ে যাওয়া যাবে না।

একুশে শহীদ দিবস তাঁরই চাঁদা।

প্রতিবছর শহীদ দিবসের একমাস আগে থেকেই গোটা বাংলা দেশে আমাদের সরস্বতী, দুর্গা বা কালী পূজোর মত চাঁদা আদায়ের দৃশ্য চোখে পড়বে।

শাহীদুল ইসলাম বললেন, বাসে মেহমান লোক আছেন। বন্ধু রাষ্ট্রের লোক।

ওই কিশোরদের বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছিল না। তারা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে কানমলা খেল আমাদের ও বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের ব্লেজার দেখে। "অন্যায় হইছে, খুব অন্যায়। আপনারা বন্ধু রাষ্ট্রের মানুষ ক্ষমা করবেন।"

দৌলতপুর, ফুলতলা নোয়াপাড়া হয়ে আমরা দ্রুত এগিয়ে চললাম যশোহরের দিকে।

বাসে আমার ধারে ছিলেন সেই 'শটগান' জাহীদুল। আমি তাঁর কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা খবর নিচ্ছিলাম। আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক নানান তথ্য। জাহীদুল জানতে চাইলেন, কলকাতা ও ভারত সম্পর্কে নানান খবর।

আমি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জানলার বাইরে রাতের বাংলাদেশকে দেখছিলাম। পীচের রাস্তার দুধারে বাঁশ বাগানের মাঝে কখনও হ্যারিকেন, কখনও লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ছিল। শেয়ালের ডাক তো শুনেছি যশোহরে বাংলোয় শুয়ে শুয়ে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম বিজলী বাতির ব্যাপক প্রসারে। কোঠা বাড়ি বা শহরের পত্তন যেখানে, সেখানেই পাখা আলো চলছে ও জ্বলছে। একটু সম্পন্নদের বাড়িতে টেলিভিসন। টেলিফোনের প্রচলনও ভীষণ।

সাতটার মধ্যে যশোহরের ডাক বাংলোয় পৌঁছলাম। সালভি এসে অনুরোধ করলেন এই যে রিপোর্টার, খানা মৎ খাও। ওদের রিকোয়েস্ট কর, হাতে পায়ে ধরে বল, আর খাওয়াবেন না দাদা।

আমি—লেকিন অম্রুত্।

—অম্রুত্ জরুর পিয়েগা।

কলকাতায় খবর পাঠাবার তেমন কিছু ছিল না। তবুও ঢাকা অফিসে ফোনে জানলাম, আমরা মংলা থেকে ফিরেছি। আগামীকাল সকালে ফরিদপুর রওনা হব।

রাত্রেই অধিকাংশ তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিলাম। কেননা, আগামী কাল ভোরেই আবার যাত্রা শুরু হবে।

ইতিমধ্যে আমাদের শেফ-দ্য-মিশন, ম্যানেজার ও কোচ জরুরী বৈঠকে বসলেন। কোচ এদের নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। একদিনও প্র্যাকটিস হচ্ছে না। অথচ খেলোয়াড়রা খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়েই চলেছে। এবং এই চারিদিনে প্রত্যেকের ওজন বেড়েছে। এরপর এরা খেলবে কেমন করে?

সিদ্ধান্ত হল ফরিদপুর রওনার আগে একঘণ্টা প্র্যাকটিশ করতে হবে। সকাল সাড়ে চারটেয় উঠে প্র্যাকটিস করতে হবে। সকলেই করবে। যশোহরে সেদিন বেশ ঠাণ্ডা ছিল। কয়েকজন তাই অজুহাত দেখাল শরীর খাবাপের। কেউ বলল—আগে বললেন না কেন, তাহলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তাম।" এবার ম্যানেজার কঠোর হলেন—প্রত্যেককে প্র্যাকটিসে আসতে হবে। তা না হলে কালই এখান থেকে ফেরৎ পাঠাবো।

এবার কাজ হল।

১৪ ফেব্রুয়ারী

ভোরে সকলেই প্র্যাকটিসে নামল। আশ্চর্য হলাম কোচ ওয়ালঞ্জের প্রস্তুতিতে। সাড়ে চারটার মধ্যে তার দাড়ি কামানোও শেষ।

প্রতিদিনই দেখেছি বেড টি-র আগেই তার স্নান ও দাড়ি কাটা হয়ে যায়। শীত, গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই সকাল ছটার মধ্যেই তিনি সারদিনের জন্য প্রস্তুত।

ত্বদিনেই যশোহরের প্রতি কেমন যেন প্রেমে পড়ে গেলাম। ব্রেক ফাস্টের পর জামা প্যাণ্ট পরে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলাম বাসের জন্য। ঘর ছেড়ে কিছুতেই বের হতে ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু 'যেতে নাহি দিব' বোধ হয় সর্বত্রই অচল। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার বাস এল। দ্রুত বাক্স পেটরা উঠে গেল। এবার প্রত্যেকে উঠল নিজের ব্যাগ নিয়ে। ডাঃ হুদা, যশোহরের ডেপুটি কমিশনার শাহিত্বল ও জাহীত্বল ভ্রাতৃদ্বয়—প্রত্যেকেই আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে অপেক্ষমান।

'ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী জিন্দাবাদ'। 'যশোহর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত বাংলোর প্রবেশদ্বার। শাহীত্বল ওখানেই হাত চেপে ধরে বললেন, "বুকটা বড্ড খালি খালি লাগছে।" আমি বললাম, ঢাকায় দেখা হবে। আমি তো বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি না। তবুও ওরা সাশ্রুনয়নে বিদায় জানালেন।

যশোহর রোড ধরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে চলে এলাম। সেদিনও বাস ধর্মঘট চলছে বাংলাদেশে, তাই রাস্তা বেশ খালি ছিল।

ঝিনাইদহ-র কাছে আমাদের বাসের গতি হঠাৎ কমে গেল। 'খারাপ হল নাকি'? সাহেব আলির প্রশ্নের জবাবে প্রধান চালক জানালেন—না ঠিকই আছে। চিন্তার কারণ সেই। কিন্তু মাইল ত্বয়েক এগোবার আগেই বাস সত্যি সত্যিই থেমে গেল। তিনি জানালেন, এ সি পাম্পে ময়লা জমেছে তাই তেল আসছে না।

—সঙ্গে যন্ত্রপাতি আছে?

—না।

—দূরের পথে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আনেন নাই ক্যান্?

—নতুন বাস। দরকার মনে করি নাই। সকলে নেমে ঠেলা শুরু করলাম। বাস চলতে থাকল ঘণ্টায় দশমাইল, কখনও বারো মাইল বেগে। কিন্তু প্রতিবারই ব্রিজের উপরে ওঠার আগে থেমে যেতে থাকে। কিছু ব্রিজ পার হলাম অনায়াসে, তবে বেশির ভাগ ব্রিজের সামনে ধাক্কা না খেয়ে বাস এগোয়নি।

ধীর গতিতে লাভ হল অন্যদিক দিয়ে। সবুজ বাংলাদেশকে দেখার। সুযোগ পেলাম। বাঁশবন, আমবন, ক্ষেতে তরিতরকারী, আউসের চাষ; কোকিলের ডাক, শিমূল ফুলের গন্ধ শহর থেকে দূরে গ্রামের মাঝদিয়ে পিচ ঢালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছিলাম—এই হল সোনার বাংলা। বাস দেখে ন্যাংটো ছেলের দল ছুটে এল। অবুঝ শিশুর দল এল, চলে গেল কোনো কথা না বলেই। শুধু আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। রাস্তার ধারে ছেলে ও মেয়েদের স্কুল চোখে পড়ল একাধিক। খেলার মাঠে হাডুডু (কবাডি) খেলা হচ্ছে, নিয়ম কানুনের বালাই নেই। কিন্তু খেলা চলছে সত্যিই। বুঝলাম কবাডি বাংলার মাটির খেলা।

প্রবীণ রেফারি মধুসূদন বাবু ওদের দেখিয়ে বললেন—এই কদিনেই এর প্রচার হয়েছে? উত্তর দিলেন সাহেব আলি—নিশ্চয়ই নয়। যে কুনো জায়গায় গেলেই এই রকম দ্যাখবেন।

আমি বললাম, ওরা কবাডি খেলছে অথচ জানেই না কয়েকশ' গজ দূরে এই বাসে ভারত ও বাংলাদেশের সেরা কবাডি খেলোয়াড়রা রয়েছে।

ফরিদপুরে পৌঁছবার কথা সাড়ে বারোটার মধ্যে। অথচ পঞ্চাশ মাইল দূরে যখন তখনই সওয়া বারোটা।

বাস যেভাবে চলছে, তাতে খুব সন্দেহ আমরা সন্ধ্যার আগে গন্তব্যস্থলে যেতে পারব কিনা। ধীরে ধীরেই চলছিল। কিন্তু একেবারে বন্ধ হলে রক্ষা নেই। ডিজেল বাস মেরামতের কোনো ব্যবস্থাই নেই মাঝপথে। সারাতে হবে সেই ফরিদপুর গিয়ে। ফরিদপুর শহরে

পৌঁছলাম বেলা দুটোয়। আমাদের বাস থামল বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনের ফরিদপুর গ্যারেজের সামনে। আগে ওই গ্যারেজের জায়গায় ছিল হেলিপ্যাড। ওখানেই ভয়াবহ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা হয় কিছুদিন আগে।

বাস দাঁড়াল 'প্রান্তিক' হোটেলের সামনে। শহরের পশ্চিমপ্রান্তে এই হোটেল। বাস থেকে নামতেই ভারতীয় দলকে সংবর্ধনা জানানো হল ফুলের মালা দিয়ে, 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী এক হোক' 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ। ইন্দিরা গান্ধী জিন্দবাদ' ধ্বনি দ্বারা।

বিরাট হোটেল। লম্বা দোতালা বাড়ি। সামনের প্রাঙ্গনে চমৎকার বাগান। প্রত্যেকটি ঘরের সঙ্গে বাথরুম, খাওয়ার আধুনিক সব ব্যবস্থা। বিরাট ডাইনিং হল, প্রত্যেক ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

টয়োটা গাড়ীতে চড়ে পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের দোহারা এক ভদ্রলোক নেমেই হাত নাড়লেন। বললেন, "আমি দিলীপবাবু"। বুঝতে দেরী হল না। ইনিই প্রান্তিকের মালিক——ডেভিড দিলীপ কুমার সাহা। হিন্দুই ছিলেন। মুক্তি যুদ্ধের সময় খান সেনাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়েছিলেন কাছাকাছি। তাঁর আশ্রয়ে হিন্দু-মুসলমান অসংখ্যজন ছিলেন। ফিরে এসে বুঝতে পারেননি কবে যুদ্ধ শেষ হবে বা কবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে? বাঁচার জন্য তাই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেন। দিলীপবাবুর নামের আগে তারপর থেকেই ডেভিড যোগ হয়েছে।

আলাপ হল স্মার্ট এক তরুণের সঙ্গে। তিনি ফরিদপুর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েসানের সম্পাদক চৌধুরী মমতাজ হোসেন। স্বর্গত বিশিষ্ট নেতা মোহন মিঞার ভাইপো। খেলাধুলোয় ভীষণ উৎসাহ। জমিদার বাড়ির ছেলে। অতীতের প্রথা অনুযায়ী এখনও নাকি তিনি প্রতিদিন প্রভাতে প্রথম দশজন দর্শনার্থীকে একটি করে রূপোর টাকা দেন।

দেখা হল ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার মহম্মদ আলির সঙ্গেও।

কবাডির জন্য সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন।

ডেভিড দিলীপবাবু তাগাদা দিয়ে গেলেন—স্নান সেরে আসুন, লাঞ্চ প্রস্তুত। এতক্ষণ এরজন্যই অপেক্ষা করছিলাম। প্রচণ্ড খিদের মুখে স্নান করতে মন সায় দিচ্ছিল না। তবুও দ্রুত 'গোছল' করে ডাইনিং রুমে বসে গেলাম। ডাল, বেগুন ভাজা, আলুকপির তরকারী, ইলিশ ভাজা, আর মাছের ঝাল—চমৎকার সব রান্না। দিলীপবাবু সবিনয়ে বললেন: আপনাদের দেরি দেখে তেমন খাওয়াতে পারলাম না। রাতে যেমন চাইবেন, তেমনি পাবেন।

আকণ্ঠ খাওয়ার পর কী পরবর্তী মেনুর জন্য ভাবতে ভাল লাগে? তবুও দিলীপ বাবুর অনুরোধে আলোচনায় বসতে হল। তাঁর জিজ্ঞাসা ফরিদপুরে আমরা কী কী খেতে চাই। ইতিমধ্যে আমাদের খেলোয়াড়দের মনোভাব জেনে ফেলেছি। যারা (অবাঙালী) কখনও মাছ পছন্দ করে না, বাংলাদেশে এসে তারাও 'মছলী'-র ভক্ত হয়ে পড়েছে। চিকেন, মাটন ছেড়ে ওরা মাছের দিকে বেশি ঝুঁকেছে। ঝুঁকবে না-ই কেন—অমন চমৎকার স্বাদের মাছ কোথাও পাওয়া যায় না যে।

দিলীপবাবু জানালেন, তাঁর হোটেলে আমাদের সেণ্ট্রাল ফিসারিজের এক অফিসার আছেন। (পরে আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে—বাড়ি বেহালায়):তিনি পদ্মায় ধরা ইলিশ দেখে কিনেছেন ও ভারতে পাঠাচ্ছেন। কলকাতার ভিভিন্ন বাজারে ওই মাছ বিক্রি হয়।

যশোহরে শুনেছিলাম ফরিদপুরের লাল রুই বিখ্যাত। দিলীপবাবুকে ওই মাছের কথা বললাম। (পরদিন তিনি ৩০ সেরেরও বেশি ওজনের একটি জ্যান্ত লাল রুই হাজির করেন)। তিনি বললেন, এখানকার পদ্মার ইলিশ খুব ভাল। চিতল পাবদা পাবেন। অর্থাৎ পাবদার আকৃতি চিতল মাছের মতই বড়। এছাড়া কৈ মাছ ত আছে। কিন্তু যশোহরের মত নয়। গলদা ও বাগদা চিংড়ীর কথা তুলতেই তিনি

সবিনয়ে জানালেন—চিংড়ী বাংলাদেশে পাবেন না।

সব চিংড়ী এখন বিদেশে চালান যাচ্ছে। প্রচুর বিদেশী মুদ্রা পাচ্ছে বাংলাদেশ। আমরা অন্যান্য মাছও রপ্তানী করছি। তবে চিংড়ীর চাহিদাই বেশি।

ইতিমধ্যে টাইপ করা প্রোগ্রাম হাজির। এবং একটু পরে ঢাকা থেকে এম এ হামজা এলেন তৃতীয় টেষ্টের তদারকী করতে।

সন্ধ্যায় ফরিদপুর স্টেডিয়ামে শিল্প প্রদর্শনী দেখতে যেতে হবে। সেখানেই চা-এর নেমন্তন্ন। তারপর সিনেমা দেখতে হবে। এসব সরকারী কর্মসূচী। বাংলাদেশের রেফারি মধুসূদন দাস সরকার বললেন, এখানেই প্রভু জগদ্বন্ধুর মন্দির রয়েছে। খানসেনারা বোমা ফাটিয়েও ভাঙতে পারেনি। তবে অনেক জায়গায় ক্র্যাক্ হয়েছে। বিখ্যাত মজুমদার বাড়ীতেও যেতে পারেন।

শিল্প প্রদর্শনীতে গিয়ে আলাপ হল ভুলুবাবু ও নৃপেনবাবুর সঙ্গে। ফরিদপুরের যে কোনো বড় কাজের সঙ্গে ওঁরা জড়িত থাকেন। কলকাতায় আত্মীয় স্বজন অনেক। খেলার মাঠেও একদা ভীষণ আনাগোনা ছিল। কলকাতার স্পোর্টিং ইউনিয়নের ফুটবল কোচ রমনী সরকার ওদের ভীষণ ঘনিষ্ঠ। গল্প আর ফুরোতে চাইছিল না। কখনও ভুলুবাবু, নৃপেনবাবুকে দেখিনি। কিন্তু প্রথম আলাপে এমন আপনজন হয়ে গেলাম যে ওদের বাদ দিয়ে ফরিদপুরের কথা কাউকে কোনোদিন বলতে পারব না। ওদের কাছেই শুনলাম মোহনবাগানের শিবদাস—বিজয়দাস ভাদুড়ী এবং গোষ্ঠপাল ফরিদপুরের বড় মাঠেই (এখন সেখানে স্টেডিয়াম) খেলে গেছেন। এখন ওই মাঠে নিয়মিত ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল ও কবাডি খেলা হচ্ছে। মাঠের ধারেই যে লম্বা দীঘি আছে, সেখানে হয় সাঁতার। ওটি অনতিবিলম্বে সুইমিং পুলে রূপান্তরিত হবে।

মাঠে যেতেই শত শত লোক হাজির। ভারতীয় কবাডি দলকে দেখার জন্য তাঁরা অপেক্ষমান। মাঠের প্রোগ্রাম সেরে গেলাম

সিনেমা দেখতে। অনেক দেরী হয়েছে আমাদের। তাই বই শুরু হল আধ ঘণ্টা পরে। দর্শকরা তাতে ক্ষুণ্ণ নন। বন্ধু রাষ্ট্রের অতিথিদের সম্মানে তাঁরা নিজেদের অসুবিধায় কুণ্ঠিত নন! হলের সামনে হাজির হতেই অসংখ্য মানুষ ফুল ছড়িয়ে শঙ্খধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানালেন আমাদের। তারপর শুরু হল কবরী-রেজ্জাক অভিনীত 'ময়নামতী'।

সিনেমা দেখে হোটেলে ফিরে শুনলাম ফরিদপুরের সর্বত্র ১৪৪ ধারা, কোথাও বা কার্ফু জারি হয়েছে। কেননা আগের দিন মন্ত্রী শ্রীফণী মজুমদারের দক্ষিণ হস্ত—শাজাহান খুন হয়েছেন।

রাস্তাঘাট দেখে কিছুই বুঝতে পারিনি। আমার প্রশ্ন জাগল, সারা ফরিদপুরে ১৪৪ ধারা থাকলে আগামীকাল খেলা হবে কেমন করে?

ডেপুটি কমিশনার জানালেন, কোনো অসুবিধা হবে না। খেলার আগে পরে ২ + ২ = ৪ ঘণ্টা এবং খেলার সময়ে সব কিছু শিথিল করা হবে।

সাড়ে নটার মধ্যে ছোট ডেসপ্যাচ পাঠিয়ে দিলাম ঢাকায় টেলিফোনে।

অচিন্ত্যবাবু, আমি ও সালভি গল্প করছি। খেলোয়াড়রা একে একে এসে অভিযোগ করল—ফরিদপুরের জল তাদের সহ্য হচ্ছে না। জলে মাত্রাতিরিক্ত আয়রণ। ডেভিড় দিলীপবাবু সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান করলেন। নির্দেশ হল সকলের জল ফুটিয়ে দেওয়া হবে। তদুপরি খাওয়ার পরে মাথা পিছু একটি করে ডাব এবং সকাল সন্ধ্যায় খেজুর রস—সেই 'অমৃত্'।

১৫ ফেব্রুয়ারী

গতকালই বিভিন্নস্থানে পোস্টার দেখেছিলাম ফরিদপুরের তৃতীয় টেস্টের। আজ সকাল থেকেই সারা শহর সরগরম। ব্রেকফাস্টের পরেই একবার স্টেডিয়ামে কবাডি কোর্ট দেখতে গেলাম। যেতে যেতে মাঝে নেমে বাংলাদেশ শিবিরে ঢুকলাম। কোচ সাহেব আলি সকলকে বোঝাচ্ছেন আজ কী কী ট্যাকটিক্সে খেলবে। কেমন ভাবে হানা দেবে বা কেমন ভাবে হানাদারদের ধরবে ইত্যাদি।

দুপুরে খেয়ে বিশ্রাম করছি; হঠাৎ একদল কিশোরের আগমন। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। চেনা জানা নেই ওরা এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেন? দরজা খুলতেই ওরা বিনীতভাবে জানাল—টিকিট কোথাও নেই, সব বিক্রী হয়ে গেছে। উপায় না দেখে আপনাদের কাছে এলাম। আপনারাই ব্যবস্থা করতে পারেন। আমি বললাম ভারতীয় দলের কেউ এখানে নেই। সকলেই স্টেডিয়ামে চলে গিয়েছেন।

—আপনি কে?

—ওদের সঙ্গেই এসেছি। খবরের কাগজের লোক!

—তবে ত কথাই নেই। আপনি আরও বেশি ব্যবস্থা করতে পারবেন।

ভীষণ বিপাকে ফেলে দিল ওরা। উপায় না দেখে বললাম, চলুন ভাই আমার সঙ্গে।

কোর্টের ধারেই স্টেডিয়াম। সব রাস্তাতেই প্রচণ্ড ভিড়। মানুষে মানুষে একাকার। সাম্প্রতিক কালে ফরিদপুরে এমন ভিড় হয়নি কোন খেলা ঘিরে। পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবকেরা জনতা নিয়ন্ত্রণ করছে। সঙ্গী সেই কিশোররাই ভিড় ঠেলে রাস্তা বানিয়ে আমাকে নিয়ে গেল।

কিন্তু ওদের ঢোকাই কেমন করে? কলকাতার খেলার মাঠের পুলিশ গেটম্যান, কর্মকর্তারা কত চেনা, তাই পারিনা কাউকে বিনা টিকিটে খেলা দেখাতে, আর ফরিদপুরে? গেটের দিকে তাকাতেই একজন কর্মকতা হাত তুলে ডাকলেন—"আসেন আসেন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করত্যাছি।" আমি তাঁকে এগিয়ে আসতে বললাম। জানালাম কি বিপাকে পড়েছি। পিছনে দেখি শ'খানেকেরও বেশি ছেলে। সকলেই ঢুকতে চায়, দেখতে চায় খেলা। ওদিকে স্টেডিয়ামে পা ফেলার জায়গা নেই। এত অতিরিক্ত টিকিট খিক্রী হয়েছে যে, অনেকে মাঠেও স্থান নিয়েছেন। আর সেই চাপ সামলাতে পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবকরা হিমসিম খাচ্ছে।

সেই কর্মকর্তা গেটখোলার নির্দেশ দিলেন। আর আমাকে চুপি চুপি বললেন, "আপনি ওদের আপনার সঙ্গেই ঢুকতে বলুন।"

ভিতরে ঢুকতে পেরে ওরা আমাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাবে ভেবে পাচ্ছিল না। আমি বললাম, ভাই এবার আপনারা বসার জায়গা করে নিন।

কোর্টের ধারে প্রেস বক্স পর্যন্ত যেতে হল পুলিশের সাহায্য নিয়েই। সেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ হল।

সাংবাদিক হিসাবে গেলেও যশোহর থেকে বিদায়ের আগে জাহীদুল ইসলাম তাঁর একটি দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে দেন। অচিন্ত্যবাবুর ক্যাসেটে তিনি তার রেকর্ডটি (ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত) ঢুকিয়ে দিয়ে বলেন, "দাদা ফরিদপুরে খেলা শুরুর আগে আপনি এটি বাজাবেন।"

ফরিদপুরে খেলার আগে পরিচয়ের পালা শেষ। যোগাযোগ দফতরে প্রতিমন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুর দুই দেশের জাতীয় পতাকার সামনে দণ্ডায়মান হতেই আমার কাজ শুরু—ওই রেকর্ড বাজানো।

কিছুক্ষণের মধ্যে খেলা আরম্ভ হল। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি কোথাও খালি নেই। ছাদে, গাছের মাথায়, বাড়ির বারান্দায়, বিদ্যুৎ স্তম্ভে—সর্বত্র মানুষের ভিড়। ৩৫ হাজার জনসংখ্যার ফরিদপুর শহরের অন্তত ১৪ হাজার মানুষ এসেছেন কবাডি দেখতে।

তৃতীয় টেষ্টে ভারতীয় দলে নামল—শেখর শেঠী, এম সুভান্না, বসন্ত সুদ, এম এস বিচারে, মহম্মদ এজাজুল্লা গৌরী, শেখর পাতিল ও কোটেশ্বর রাও।

বাংলাদেশ দলে—মকবুল ইসলাম, মহম্মদ সালেক, রুস্তম আলি শেখ, জাহাঙ্গীর আলম, আমির হোসেন, জুলফিকার আলি ও সুবিমল দাস।

রেফারি—ওসমান গনি। আম্পায়ার—মধুসূদন দাস সরকার ও জেড আলম।

শুরুতেই ভারতের সি এম পাতিল হানা দিয়ে একটি পয়েণ্ট করল। কিছুক্ষণ কাটাল উভয় দল আত্মরক্ষায়। তারপর ভারত-অধিনায়ক শেখর শেঠি হানা দিতে গিয়ে ধরা পড়ে (১—১)। ধরা পড়ল এম এস বিচারে। বাংলাদেশ ২—১ এগোল ; এবার মকবুল দ্রুত হানা দিয়ে ৩—১ করল। ফরিদপুর স্টেডিয়ামে তখন দারুণ উত্তেজনা। আজ বাংলাদেশের খেলারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু তারা গ্যালারির করতালিতে বুঝিবা কিছুটা উত্তেজিত। এজাজুল্লা গৌরী এবার মরীয়া হয়ে হানা দিল, এবং ভারতের জন্য একটি পয়েণ্ট সংগ্রহ করল (২—৩)। ইতিমধ্যে বিচারে বেঁচে উঠেছে। বাংলাদেশের পরবর্তী হানায় সে একজনকে পাকড়াও করল (৩—৩)। বিরতির আগে উভয়দল আর একটি করে পয়েণ্ট পেল (৪—৪)।

বিরতির পর খেলার আরম্ভে উভয় দল আবার আত্মরক্ষার পথ নিল। দর্শকদের বোধ হয় তা পছন্দ হচ্ছিল না। 'ধইরা ফ্যালো', 'মাইরা আইস'—প্রভৃতি চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। মিনিট তিনেকের মধ্যে বাংলাদেশের সহ অধিনায়ক মহম্মদ সালেক ভারতীয় হানাদার

ধরে ৫—৪ এগোল। কিন্তু শেখর শেঠি হানা দিয়ে ৫—৫ করল। খেলা হচ্ছে তুল্য-মূল্য। এবার ধরল মকবুল (৬—৫)। জুলফিকর আলি হানা দিয়ে এগোল ৭—৫। পরক্ষণেই হানা দিয়ে এজাজুল্লা ৬—৭ করে। বাংলাদেশ আবার প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত। হানাদার ধরল জুলফিকর, জাহাঙ্গীর আলম, মহম্মদ সালেক পর পর দুবার। বাংলাদেশ ১১—৬ এর সময় লোনা পেল অর্থাৎ পয়েন্ট ১৩—৬। সালেক আবার হানাদার ধরল (১৪—৬)। মকবুল হানা দিয়ে ১৫—৭ এগোতেই ভারত প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। পয়েন্ট হতে থাকে ৮—১৫, ১০—১৫, ১০—১৬, ১১—১৬, ১২—১৬, ১৩—১৬, ১৪—১৬। আমরা প্রেস গ্যালারিতে বসে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ। তবুও রেফারী আম্পায়ারে, কেউ সময়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ করছেন না। ঘোষণা করছেন না—'লাস্ট ফাইভ মিনিটস প্লিজ'। অসঙ্গত হলেও আমাদেরকেই জানাতে হল ইশারা করে 'টাইম আপ।' সতীর্থ বাংলাদেশের সাংবাদিক বন্ধুদের বললাম, তৃতীয় টেস্টে জয় বাংলাদেশের মুঠোয় এসেও চলে যাচ্ছে; তখন ১৭—১৪ পয়েন্টে বাংলাদেশ এগিয়ে। কিন্তু পরিচালক মণ্ডলী বোধ হয় উত্তেজনায় ঘড়ি দেখতে ভুলে গিয়েছিলেন। ভারত পরপর হানা দিয়ে লোনা নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ১৭—১৭ করে অতিকষ্টে অমীমাংসিত রাখে। খেলা শেষ দেখা গেল তিন মিনিট অতিরিক্ত খেলা হয়েছে। বাংলাদেশ কবাডির পুরোধা হামজা ভাই খেলা শেষে বললেন, আজ প্রায় হারছিলেন। আমি বললাম, আপনাদের জিৎ হইছে। শুধু ঘোষণাটা-ই হয় নাই। যখন শুনলেন—অতিরিক্ত সময়েই ভারত কোনোক্রমে ড্র করেছে, তা না হলে বাংলাদেশই জিতত। তিনি 'আল্লা' বলে করাঘাত করতে লাগলেন শুধু।

আমি তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে খবর পাঠাবার কাজ শেষ করলাম। সন্ধ্যা হতেই খেজুর রসের পালা। নিশাকর এ ব্যাপারে সব্বার আগে। ম্যানেজার বা শেফ দ্য মিশনের আগে ওরা আমার

ঘর খুঁজে যায়। আসলে নিশাকরই পরামর্শ দাতা—'রিপোর্টারের ঘরে গেলে সব খবর পাবে।'

অচিন্ত্যবাবু সকলকে জানিয়ে দিলেন, সন্ধ্যায় কেউ যেন বাইরে না যায়। আজ জেলা কর্তৃপক্ষ ডিনার দেবেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসবেন। আবার পার্টি? আবার সব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। বাংলাদেশে এসেও আধা সাহেবী ব্যাপারগুলো মাঝে মাঝে খারাপ লাগছিল। 'প্রান্তিক'এর কর্ণধার ডেভিড দিলীপ বাবুকে বললাম, দাদা আপনিই বাঁচাতে পারেন, আর ভাল লাগছে না। পার্টিতে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকব, কিন্তু খাব না। আপনারা রুটির ব্যবস্থা ত করতে পারবেন না, তা দুটো ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত করে দিন। উনি 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন।

ডিনারে দুই দলের খেলোয়াড়রা এলেন, এলেন শহরের সব গন্যমান্য ব্যক্তি। স্থানীয় এম, পি, বললেন: ভারত কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করেছিল। কৃতজ্ঞতা জানালেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কোটি কোটি ভারতীয় জনগণের প্রতি। আশা করলেন, খেলাধূলার মাধ্যমেও দুই বন্ধু রাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে শেফ-দ্য মিশন শ্রী এস এন সালভি দুই দেশের মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও ঘনিষ্ঠ করার আবেদন জানান। বাংলাদেশে ভারতীয় দলের সংবর্ধনায় ও আতিথেয়তায় তিনি যে মুগ্ধ বলে মন্তব্য করলেন শুধু তাই নয়, মারাঠি সালভি দু-চার লাইন বাংলা বলে অবাক করে দেন সকলকে।

ডিনার পার্টি শেষ হলেও কেউ কাউকে ছাড়তে পারছিলেন না। আমি ও অচিন্ত্যবাবু আদতে বাংলাদেশের মানুষ জেনে সকলেই নানা প্রশ্নে জর্জরিত করছিলেন। এগারটা বেজে গেল শুধু গল্পে গল্পে, কোলাকুলিতে, করমর্দনে। কারুর জিজ্ঞাসা ইষ্টবেঙ্গল—মোহনবাগান সম্পর্কে, কেউ অনুরোধ করলেন—আগামী টেষ্টের টিকিট পাওয়া যাবে কিনা। পুরনো খেলোয়াড়দের সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন করলেন কয়েকজন।

কেউ শান্তিনিকেতন দেখতে চান। একজন বললেন, দাদা, কইলকাতায় যাই নাই, জীবনডা পূর্ণ হইল না। আমি বললাম, বাল্যে বা কৈশোরে বাংলা দেশের সামান্যই দেখেছিলাম, এবার তীর্থ দর্শন করে গেলাম বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের দৌলতে।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি হলেও রাত্রের দিকে শীতের আমেজ ছিল। ডিনার পার্টিতে শুধু দই মিষ্টি খেলেও খিদেটা মেটেনি। বরং বেড়েই গেল। 'প্রান্তিক' এর হেঁসেলে গিয়ে দেখি ডেভিড সাহেব আমাদের রান্নার তদারকী করছেন।

'এই হইয়া গ্যালো' শুনে উপরের ঘরে গেলাম। সওয়া বারোটায় ডাল, ভাত আর লাল রুইয়ের ঝোল খাওয়া শেষ হলেও বাংলা দেশের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প শেষ হল রাত একটায়। পরদিন ভোরে ঢাকা রওনা হতে হবে বলেই।

১৬ ফেব্রুয়ারী

ছটা না বাজতেই সকলকে ডেকে তোলা হল। চটপট গুছিয়ে নিন, একটু পরেই বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনের বাস আসবে। গরম জলে স্নান সেরে, তল্পি তল্পা গুছিয়ে নিচে ডাইনিং হলে এলাম ব্রেকফাস্ট করতে। খেতে বসেছি, হাজির হলেন গত দুদিনে আপন জন হয়ে যাওয়া ফরিদপুর জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে কর্ম-কর্তারা। ওদের চোখে চোখ পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঠিক যেমনটি হয়েছিল যশোহর থেকে আসার সময়। খাওয়া শেষে ওরা দু'হাত ধরে বললেন, কিছু মনে কইরেন না, ত্রুটি হইয়া থাইকলে ভাই বইলা ক্ষমা কইরা নিবেন। আমি বললাম, ভাই কখনও ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চায় ত্রুটির জন্য? জেলা সম্পাদক রুমাল দিয়ে

চোখ মুছলেন। আশ্চর্য, আটচল্লিশ ঘণ্টাও ফরিদপুরে কাটাইনি। আর তার মধ্যে ওদের সঙ্গে কতটুকু মিশতে পেরেছি, কটা কথাই বা বলেছি, কিন্তু এমন কেন হয়? বাসে পা দিতে মন সায় দিচ্ছিল না। সালভি এসে তাড়া দিলেন, তুম কেয়া জার্নালিস্ট, এৎনা ইমোশনাল কেও? উত্তরে বলতে ইচ্ছে করছিল—ভায়ের মায়ের অপার স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ……।

সাহেব আলির মন্তব্য: এইয়ার লাইগা ও বাঙালীরা মইরা গেল, আবার বাঁইচাও আছে।

মনে মনে ফরিদপুরকে, ফরিদপুরের অসংখ্য মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

পিচের রাস্তা ধরে আমাদের বাস এগিয়ে চলেছে ঢাকার দিকে। কিন্তু নদী-মাতৃক বাংলাদেশে পিচের রাস্তা দিয়ে কতক্ষণ চলা যায়। ওই রাস্তা পেরিয়ে খোয়ার রাস্তায় পড়লাম। সাহেব আলি বললেন —আমরা শর্টকাট দিতাছি। আর একটু পরেই পদ্মার বুকে পড়ুম।

আমাদের বাস আসল রাস্তা ছাড়িয়ে খোয়া ছড়ানো অস্থায়ী মাঠে পড়ল। এই মাঠের সুরু থেকেই পদ্মার বুক। শীতে শুকনো থাকলেও বর্ষায় সে ভয়াল হয়ে উঠে। তখন কেউ কল্পনাও করে না —যে শীতে তার বুকে বাস চলে। তখন স্টীমারের কথাও ভাবা যায় না। ধুলো উড়িয়ে আমাদের আগে পিছু আরও বাস প্রাইভেট কার, রিক্সা চলেছে। রাস্তার দুধারে অসংখ্য কৃষক কাজে ব্যস্ত, সব্জী ডাল, কত কী চাষ করছেন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। এগুলো শুধু শুকনোর মাস কটির জন্য। শুধু কি তাই, এ বছর শীতে এখানে চাষ হলেও আগামী বছর শীতে এখানে হয়ত এমন অবস্থা থাকবে না। হয়ত সে বারোমেসে নদী হয়ে যাবে। এটাই পদ্মার আসলরূপ। সে কখন কি মূর্তি নেবে, কেউ বলতে পারে না।

শুষ্ক পদ্মার বুকের উপর দিয়ে মাইল দশেক যাওয়ার পর ছোট একটি বাজার, কিছু বসতিও দেখলাম। বাস থেকে নামতেই বাংলা

দেশের ত বটেই কলকাতার একাধিক খবরের কাগজ পেলাম। তুদিন আগের আনন্দবাজার এসেছে, খবরও বেরিয়েছে যশোহরের খেলা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। ভাবতেই পারিনি বাংলাদেশের এমন জায়গায় খবরের কাগজ পাব।

বাস থেমেছিল নদী পার হওয়ার জন্য। শীতের পদ্মা এই এই দৌলতিয়া ঘাটেও এখনও চার মাইল চওড়া। ফেরিতে পার হতে হবে। ড্রাইভার জানালেন, এখানে ঘণ্টা তিনেক কাটবে। আগের গাড়িগুলি না গেলে আমাদের ছাড়বে না। আমরা কয়েকজন ওসব কথা নিয়ে চিন্তা করলাম না। খেলোয়াড়রাও নিশ্চিন্ত—আজ ত খেলা নেই। অনেকদিন পর সবরী কলার দেখা দেখা পেলাম। সুতরাং ওগুলোর স্বাদ গ্রহণ করতে দেরি হল না। নদীর ধারে (পদ্মার বুকে রেস্তোরাঁ, স্টেশনারী দোকান সবজী, মাছ, মিষ্টি সব আছে। আমাদের ভিজিট শেষ হতে না হতেই হাঁক ডাক পড়ল। আমাদের বাস আগেই যাবে। কেননা বাসে মেহমানরা (অতিথি) রয়েছেন, এত দেরি করানো যাবে না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের আগেই বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ লাগানো একটি প্রাইভেট কার। তার আশে পাশে পুলিশ প্রহরী! শুনলাম মন্ত্রী শ্রীফণী মজুমদার ওই গাড়িতে ফরিদপুর থেকে ঢাকা যাচ্ছেন। তিনি আমাদের দেখে বেরিয়ে এসে সকলের সঙ্গে পরিচিত হলেন। খাদ্য দফতর ওঁর হাতে তাই জিজ্ঞাসা করলাম—কত ঘাটতি, গতবার কত উৎপাদন হয়েছিল ইত্যাদি। ফণীবাবু ডেকে গাড়িতে বসিয়ে সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। কিন্তু তাতে যেন ওঁর মন ভরছিল না। একদার কংগ্রেস নেতা গান্ধীজির শিষ্য ফণীবাবুর পোশাক পুরোটা মোটা খাদির। পুরানা দিনের কথা শুরু করলেন। জানালেন, স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সময় আনন্দবাজারের সঙ্গে তাঁর কত ঘনিষ্ঠতা ছিল। অনেক স্মৃতি রোমন্থন করলেন, যা ইতিপূর্বে শুনিনি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা

আন্দোলনের সময় কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের ভূমিকার। ফণীবাবু আক্ষেপ করে বললেন, সর্বত্র এখন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মূল্যবোধ কমে গিয়েছে। আমি তাঁকে বাংলাদেশের নানা কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। বললেন, যে ভাবে সকলে সহযোগিতা করছেন, সেইভাবে চললে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি বদলে যাবে—অবশ্য যদি এর মাঝে কোনোরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় না আসে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাস, প্রাইভেট কার, ট্র্যাক উঠল ওপার থেকে আসা মোটর চালিত বিরাট ফেরী 'কর্ণফুলী'তে। আমরা উঠলাম 'কর্ণফুলীর' দোতলায় ফণীবাবুর সঙ্গে। বসলাম রেস্টরুমে। পদ্মা এত শান্ত থাকে? সারেং বললেন, উপরে এই রকম, নামুন না জলে—কোথায় নিয়ে যাবে কেউ জানবে না। পদ্মা যে কেমন তা বুঝেছিলাম ওখান থেকে ফেরার দুদিন পরে। শান্ত পদ্মাতেই গোয়ালন্দ ঘাটের কাছে একটি,ফেরী লঞ্চ স্রোতের টানে উল্টে গিয়েছিল।

রেস্ট রুমে চা-বিস্কুট এল। নানাকথায় কাটল আধঘণ্টা। পদ্মার বুকে তখন আরও অনেক ফেরী লঞ্চ পারাপার করছে। কিন্তু সকলেই সতর্ক, যাতায়াত করছেও অতি সন্তর্পণে। লঞ্চের হুইশ্‌ল বাজল। আমরা নেমে পড়লাম, আবার স্থল পথে সেই বাসে যেতে হবে। নামতে নামতে লঞ্চের এক কর্মীর মুখে শুনলাম জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত এই ঘাট সচল থাকে। তারপর এখানে কাক পক্ষীও দেখতে পাওয়া যায় না। পদ্মা তখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাই ফেরী চলে যায়—পাঁচ মাইল দূরে গোয়ালন্দে। ঢাকার পারে আরিচা ঘাটে নামলাম সাড়ে দশটায়। ইলিশমাছ ধরে নিয়ে তখনই কয়েকজন এসেছেন। কিলো দুয়েক ওজনের একটি তুলে ষাট বছরের এক ধীবর জানালেন, "সায়েব, আপনারা বন্ধু রাষ্ট্রের মানুষ, বেশি নিমু না। এক টাকাই ছান।"

লোভ সামলাতে পারছিলাম না। কিন্তু ঢাকায় উঠতে হবে যে ফাইভ স্টার হোটেলে পূর্বানী-তে। ওখানে ত মাছ নিয়ে যাওয়া যায় না? যে মাছের দাম কলকাতায় অন্ততঃ বারো বা পনের টাকা কিলো তার কিলো এখানে পঞ্চাশ পয়সাও না, তাও আবার ইলিশের আদি—পদ্মার ইলিশ। একেবারে রূপকথা। আহ্ ফ্রিজে করে যদি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যেত!

আবার ডিজেল চালিত টাটার তৈরি বাস বিমান গর্জনে ছুটে চলল। আধঘণ্টার মধ্যে আবার নদীর চরে পৌছলাম, এবার কালিগঙ্গা ফেরী। নদীর অর্ধেকের বেশিই চর এখন, কিন্তু বর্ষায় সেও কমতি যায় না। তবে বাংলাদেশ সরকার কালিগঙ্গাকে আয়ত্তে আনার ব্যবস্থা করছেন ব্রীজ দ্বারা। ব্রীজের অর্ধেকটা তৈরিও হয়েছে। কাজ চলছে দ্রুত দিবারাত্র জেনারেটর লাগিয়ে। ফেরী পার হয়ে দশ মিনিটের মধ্যে মাণিকগঞ্জ মহকুমার ছোট্ট শহরকে ডান দিকে রেখে আবার এগিয়ে চলেছি। দুধারে মাঠ ধূ ধূ করছে। মাঝে মাঝে দু একটি বসতি। মাঠে অধিকাংশই ফাঁকা, আমন ধান উঠে গিয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু সব্জীর চাষ হচ্ছে, দেখলাম কেউ কেউ আউসও চাষ করছেন।

এবার আবার নদী—বংশী নদী। নয়ারহাট ফেরী পার হলে ঢাকা আর ১৬ মাইল। এখানেও নতুন ব্রীজ তৈরি হচ্ছে আধুনিক সব যন্ত্রপাতি লাগিয়ে। ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল, ডাব খাবো না অন্যকিছু। নতুন কিছু খাওয়া যাক। সাহেব আলি ভাইয়ের নিষেধ সত্ত্বেও 'কলিজা ঠাণ্ডা' শীতল পানীয়—ঘোলের সরবৎ খেলাম। বেশ লাগল। ভয় হচ্ছিল কলিজা ঠাণ্ডায় কলিজার বারোটা না বাজে। সঙ্গে অবশ্য ট্যাবলেট ছিল বাংলাদেশের আতিথেয়তাকে ঠেকাবার জন্য। কেননা, অত খাওয়া? পরমাত্মীয়রাও অমন জোর করেন না, অত আয়োজন থাকে না। তবুও তাদের এড়ান যায়। কিন্তু এমন ভাই বা বন্ধুদের কাছে গিয়ে নিজের ক্ষতি স্বীকার করাটাও যেন

মহাপুণ্যের, মহা আনন্দের।

কলিজা ঠাণ্ডা বিক্রেতা নুরুল হুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কলিজার গড় বড় হবে না ত! তার জবাব, বন্ধু রাষ্ট্রের মানুষদের ঠকামুনা। আমি আপনারে ঠকামু মানে ধইরা নিবেন শেখ সায়ের ঠকাইছেন ইন্দিরা গান্ধীরে। আমি রা কাড়তে পারলাম না।

আবার বাস প্রস্তুত, আবার চট পট সকলে উঠে পড়লেন। তখন আরও একটি ফেরী বাকি। এদিকে বেলা বেড়ে চলেছে, খিদেও বাড়ছে। বাসচালক স্পিড বাড়ালেন। কিন্তু তাতে খুব ফল হল না। ঢাকার অনতিদূরে মীরপুর ফেরীতে এসে আটকে গেলাম। ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক, প্রচণ্ড ভিড়। ওখানেই ৪৫ মিনিট কেটে গেল। ঢাকায় পৌঁছলাম সওয়া একটায়।

'পূর্বানীতে' ফিরে ভাবলাম, টেনে লম্বা ঘুম দেব। কিন্তু তার কি উপায় আছে? পাশের ঘর থেকে সালভি এসে অভিযোগ করলেন—আরে ভাই এরা কেমন লোক? এরা খাইয়ে মেরে ফেলবে নাকি! তখন নিশাকরও হাজির। সে শেফ ছ মিশনকে বলল, সায়েব তুমি ত নিরামিষ ভোজী ডিম খানেওলা, মরছি ত আমরা। এমনিতে নিশাকরের খাওয়ার ব্যাপারে নাম ডাক ওর কর্মস্থল লিলুয়া ওয়ার্কশপ ও চন্দননগর জুড়ে। দু কিলো মাংস, ৫০ খানা লুচি সন্দেশ রসগোল্লা ২৫ টি করে, দই দু কিলোতে ওর মন ভরে। সেই নিশাকরও প্রমাদ গুনছে বাংলাদেশে এসে। অচিন্ত্যবাবু বললেন, তোমরা ঘটিরা আমাদের বাঙালদের ব্যঙ্গ কর। সুপুরি-নারকেল গাছের কথা বলে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশে এসে দেখলে ত তবুও এখানে কত আছে। কে কী খাওয়ান, তার চেয়ে বড় কথা ছিল, দিল্ পাবে এমনটি কোথাও! নিশাকরের স্বীকারোক্তি: না গুরু, এমনটি কোথাও নেই।

টেলিফোন বেজে উঠল। ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল—আমি জাহীদ, দাদা কখন আইলেন?

—এই ঘণ্টা খানেক।

—কি প্রোগ্রাম আজ ?

—বিকালে কিছু ত নেই। কোথাও খেলা থাকলে দেখতে যাব। তবে আমি সবচেয়ে ইণ্টারেস্টেড অ্যাথলেটিকসে। কাগজে দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস চলছে।

—তাই হবে। সাড়ে তিনটায় আইসত্যাছি।

জনতা ব্যাঙ্কের একটি শাখার ম্যানেজার ঢাকার শটগান—শত্রুঘ্ন সিংহ এলেন তাঁর জার্মান গাড়ি নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রচণ্ড ভিড়। প্যাভিলিয়নে বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বিভাগের পরিচালকদের সঙ্গে দেখা হল। অনেক পরিচিত মুখ। কেউ কেউ বছর দুয়েক আগে ভারতে এসেছিলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের হকি দল নিয়ে। শুনলাম মুর্শিদাবাদের সেই মেয়ে—ভারত শ্রেষ্ঠ অ্যাথলীট সোফিয়া খাতুন এখন দুই সন্তানের মা, কলেজে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকসে নামে, ওদের জাতীয় অ্যাথলেটিকসে রেকর্ড করে। সুপরিচিতা সোফিয়ার সঙ্গে কিন্তু দেখা হল না। ১৯৬৫ তে এই সোফিয়া চণ্ডীগড়ে ভারতের জাতীয় অ্যাথলেটিকসে রেকর্ড করেছিল। এখন সে বাংলাদেশের মেয়ে অ্যাথলীট শুধু নয়, সব খেলার পথিকৃৎ।

অ্যাথলেটিকস, সুতরাং—বাংলাদেশ অ্যামেচার এ্যাথলেটিকসের সম্পাদক শাহীদ ভাই—শাহীদুল ইসলামেরও দেখা পেলাম। একমাত্র পুত্র সাগরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ইভেন্টের তদারকী করছেন। স্পোর্টস শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া দফতরে গেলাম। তার ধারেই বিরাট ইনডোর হল। হল নয়, যেন ফুটবল মাঠ। চারদিকে বাস্কেটবলের বাস্কেট। হলেই খেলা হয়। ভলিবল হয়, বিরাট জিমন্যাসিয়াম। সারা পশ্চিমবঙ্গে এমনটি কোথাও নেই, বিশ্ববিদ্যালয় গুলির কথা ত বাদই দিচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া দফতরের ভার প্রাপ্তরা হলের জন্য গর্বিত। কিন্তু আফশোষ তাঁদের ওই হলের তেমন ব্যবহার হয় না বলে।

নানা কথায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কার্যালয়ে আমাদের চা-এর নেমন্তন্ন। দ্রুত যেতে হল সেখানে। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলির সঙ্গে আলাপ হল। সাদা সিধে মানুষ, খেলাপাগল। বললাম, আপানার অস্ত্রে বাংলাদেশ বাবু করে ফেলেছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের উঁচু লাফে বেরিয়ে আসা। বাংলাদেশের সেকেণ্ড ডিফেন্স লাইন দারুন এফেকটিভ।

শিক্ষামন্ত্রীকে খুব খুশি মনে হচ্ছিল কবাডি দেশব্যাপী সাড়া আনায়। বললেন, ছেলেরা একে বেশ নিয়েছে, এখান আমার চিন্তা মেয়েদের মধ্যে এর প্রসারের। প্রস্তাব দিলেন, ভারতীয় মেয়েরা এলে প্রভূত উপকার হবে। কিন্তু ভারতীয় দলের ম্যানেজার অচিন্ত্যবাবু বললেন, তা কেন হবে ? শুধু আপনারা আমাদের নেমন্তন্ন করবেন কেন ? আপনারা আগে আমাদের ওখানে চলুন !

আমি বাংলাদেশের খেলাধূলা সম্পর্কেও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইউসুফ আলি সায়েবের সঙ্গে খেলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। তিনি সরঞ্জামের ভীষণ অভাবের কথা জানালেন। বাংলাদেশের অ্যামেচার অ্যাথলেটিক সংস্থার সম্পাদক শাহীদ ভাই বললেন, আগামী ১, ২ ও ৩ মার্চ জাতীয় অ্যাথলেটিকস। কিন্তু সরঞ্জাম নেই। সমগ্র বাংলাদেশে একটিও অ্যালুমিনিয়ামের জ্যাভেলিন নেই। স্ট্যাণ্ডার্ড সটপাট, ডিসকাসও কম। (অচিন্ত্যবাবু কলকাতায় ফিরে অবশ্য জাতীয় অ্যাথলেটিকসের জন্য কিছু সরঞ্জাম পাঠিয়েছিলেন)।

১৭ ফেব্রুয়ারী

আজও ছুটি। ছুটি মানে খেলা নেই। কিন্তু কর্মসূচী সারাদিন-ব্যাপী। আজ আমাদের অভিভাবক শ্রীননী বসাক ওরফে ননীদা। বয়স প্রায় ষাট, সব চুল সাদা, এমন হাসি খুশি প্রাণোচ্ছল মানুষ

আজকাল সচরাচর দেখা যায় না। বাংলাদেশের স্কাউটের সর্বেসর্বা। স্কাউট কমিশনার ননীদারই ছোট মেয়ে পাক বাংলাব সেরা অভিনেত্রী শবনম্। এখন তিনি পাকিস্তানের সেরা অভিনেত্রী। জামাই রবীন ঘোষ পাকিস্তানের সঙ্গীত পরিচালক।

আজও আমাদের বাহন বাস। দু-একজন বাদে উভয় দলেব খেলোয়াড়, ম্যানেজার, কোচ এবং এই অধম চললাম ঢাকাব কাছাকাছি দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখতে।

প্রথমে 'অমর ১৯ শে সড়কে'। ১৯৫৫ এর মার্চে ই, পি, আরও মিলাটারির লড়াইয়ে নিহত বাঙালীদের স্মরণে নির্মিত শহীদ মিনারে দেখলাম অসংখ্য নাম খোদাই করা। ওরই একদিকে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, আর একদিকে জয়দেবপুরের ধান গবেষণা কেন্দ্র। একটু এগিয়ে ১৯০৫ সালে ভাওয়ালের রাজমাতার নামে স্থাপিত রানী বিলাসমণি হাইস্কুল। আব একটু পবে ভাওয়ালের রাজবাড়ী। দোতালা বাড়ির চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের গা দিয়ে তিন-দিকের খালটিতে এখন জল ভর্তি। ওই বাড়িতে এখন বাংলাদেশ রেজিমেন্টের অফিস। বাড়ির সামনে বিরাট মাঠ। পুরো জায়গাটা 'প্রোটেক্টেড'। চারিদিকে কড়া পাহারা।

এবার কিছু দূর গিয়ে মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ। এটি টাঙ্গাইল জেলার মধ্যে। বাংলাদেশের চারটি ক্যাডেট কলেজের এটি অন্যতম। এমন খেলামেলা পরিবেশের ক্যাডেট স্কুল কদাচিৎ দেখা যায়। আজ রবিবার ছুটি, কলেজের অধ্যক্ষ বা শিক্ষকদের কাউকে পেলাম না। আজ সব দায়িত্ব ছাত্রদের। ডিসিপ্লিন যে এখনও মিলিটারিতে আছে, তা ওই কিশোররা বুঝিয়ে দিল। আমরা যতই মেহমান হই না কেন—যথারীতি অনুমতি নিতে হল। তবে সেই জন্য বাধা পেতে হয়নি ননীদা ও সাহেব আলী-র জন্য। ওঁরা দুজন ওখানে ভীষণ পরিচিত। সাহেব আলীকে অনেকেই ফুটবল কোচিং দিতে দেখেছে, ননীদার স্কাউটদের অনেকেই ক্যাডেট কলেজের ছাত্র।

১৫ বছরের ছেলে ইসলামের উপর সেদিন গোটা কলেজের প্রশাসনের দায়িত্ব। সে সব কিছু আমাদের বুঝিয়ে দিল।

মাঠে তখন ক্রিকেট খেলা চলছে। আমি ইসলামকে বললাম, ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সে অনুমতি দিতেই এগিয়ে এল ক্রিকেটাররা। ভারতের লোক শুনে আবদার করল, দেশে ফিরে কিছু স্পোর্টস গুডস পাঠাবার কথা লিখবেন। জানেন, এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। আপনাদের এই ব্যাট ৪৫০ টাকায় কেনা, বল ৫০ টাকা। আমাদের কলেজ দিচ্ছে তাই খেলছি। সাধারণের পক্ষে এসব কি সংগ্রহ করা সম্ভব ?

মোমেন শাহী কলেজে ছাত্র ৩২০। ওদের জন্য সরকার প্রতি-মাসে মাথাপিছু ৪৫০ টাকা ব্যয় করে, ছাত্রদের দিতে হয় বছরে ১৮০০ টাকা। ফজলুল হক হল, সোহরাওয়ার্দি হল, নজরুল হল দেখলাম। ভর দুপুরে একদল ছাত্র পড়ছে, সামনেই ওদের ফাইন্যাল পরীক্ষা। কেউবা টেবল টেনিস, দাবা, ক্যারাম নিয়ে ব্যস্ত। কেউ লাইব্রেরীতে। আবার কেউ কোনো কাজে ফাঁকি দেওয়া বা অন্য কোনো অন্যায় করে শাস্তি ভোগ করছে দুপুর রোদে প্যারেড করে করে। ডাইনিং হল সাজানো প্লেট, চামচ দিয়ে। উঁচু মঞ্চে কয়েকটি টেবিল রয়েছে, সেখানে বসে বিভিন্ন বিভাগীয় (ছাত্র) পরিচালকরা। গ্লাসে জল ভর্তি। ওই গ্লাস নিয়ে এক কবাডি খেলোয়াড় খাওয়ার উপক্রম করতেই বুঝল সিভিলিয়ানদের ওই গ্লাস ধরা নিষেধ। তারজন্য আলাদা জল এল।

বাংলাদেশের কোচ ও ভারতীয় দলের ম্যানেজার নিজ নিজ খেলোয়াড়দের বুঝিয়ে দিলেন নিয়মানুবর্তিতা কাকে বলে। প্রতি দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কীভাবে এরা চলাফেরা করে।

এবার বাস চলল ভাওয়ালগড়ের বিরাট শাল বীথির ভিতর দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর পৌঁছলাম ননীদার ল্যাণ্ডে। ৬৪ বিঘা জমি নিয়ে বাংলাদেশের স্কাউটদের নিজস্ব জায়গা। সেখানে নানা

রকম ফসল ফলে, পিকনিকের দারুণ স্পট, ছুটির দিনে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনসকেও হার মানায়। ছোট ছোট ঘর আছে, পাবেন রান্নার বাসন কোসন অল্প ভাড়ায়। চমৎকার পরিবেশ। ওখানকার সব আয় চলে যায় স্কাউট তহবিলে। আমরাও পিকনিকে মেতে গেলাম। তবে রান্না করে নয়। সঙ্গে প্যাকেট লাঞ্চ ছিল। আগেই বলেছি বাংলাদেশে সায়েবীপনা মোটেই ভাল লাগছিল না। পাশে খিচুড়ী, মাংস বারংবার জিভে জল এনে দিচ্ছিল, তবুও উপায় নেই 'বিদেশী' মানুষ; প্রোটোকল মানতে হবে। আমিও প্রাক্তন স্কাউট। ননীদাকে বললাম, স্কাউটরা ত সবদেশে সমান! ননীদা ইন্ধন দিলেন—ভায়া রিপোর্টার বলে একবার চেখে দেখে এস।

তার আর উপায় ছিল না। প্যাকেট ল্যাঞ্চই পুরোটা সাবাড় করতে না পেরে একে ওকে দিতে হচ্ছিল, ভর করছিলাম নিশাকর আর ওর 'মামা'—বিচারের উপর।

খাওয়ার পর দুই দলের খেলোয়াড়দের এমন হল যে সাহেব আলি অনেক তাঁতিয়েও কারুর কণ্ঠ দিয়ে গানের সুর বের করতে পারলেন না।

সাড়ে তিনটে নাগাদ হোটেলে ফিরে একটু বিশ্রাম না করতেই আবার কর্মসূচী সুরু হল। শিক্ষামন্ত্রকের যুগ্ম সচিব জনাব জ্যাকারিয়া এলেন। নানা আলোচনা: কবাডির পর দু দেশের মধ্যে আর কী কী খেলার বিনিময় হতে পারে। কম খরচে বাংলাদেশে কোন্ খেলার প্রসার সম্ভব, ভারতে কী কী পরিকল্পনা হচ্ছে খেলার উন্নতিতে ইত্যাদি। ভারতীয় দলের শেফ-দ্য মিশন ও ম্যানেজার এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার আহ্বায়ক কাজি আনিসুর রহমান, কবাডির সম্পাদক জনাব হামজা আলোচনান্তে স্থির করলেন—১৯৫৫-এ বাংলাদেশ কবাডি দল ভারত সফরে যাবে। আলোচনা শেষ করেই গন্তব্যস্থল বাংলা একাডেমী। সেখানে প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা সভা, সঙ্গীত, নাটক নৃত্য কত কী! কলকাতা

থেকেও সাহিত্যিক, শিল্পীরা এসেছেন। দেখা হল নরেন্দ্রনাথ মিত্র; মনোজ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, সবিতাব্রত দত্ত, প্রদীপ ঘোষ, মায়া সেন, বিনয় সরকার, সুমিত্রা সেন প্রমুখের সঙ্গে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য প্রদর্শনী দেখা। বইয়ের প্রদর্শনীতে ঢুকেই প্রথম দেখা ইষ্টার্ণ রেলের প্রাক্তন অফিসার কে, কে, দাস ওরফে কল্যাণ বাবুর সঙ্গে। ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশন অফিসে এখন তিনি রেলওয়ে অ্যাডভাইসার। প্রদর্শনীতে অবাক হলাম বইয়ের দাম দেখে। চমৎকার ছাপা ও বাঁধাই, তেমনি কাগজ। বাংলা একাডেমীর এই বইগুলো নিশ্চয় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলে দ্বিগুণ দাম হত। ঢাকায় বই সস্তা। কারণ, কাগজের দাম ভীষণ কম। আর প্রেস ? অফসেটের ছাড়াছড়ি। রচনাবলীও ওখানে বের হয়েছে নানান জনের। তবে অবাক করেছে শিবাজী রচনাবলী। ওঁরা ধর্মনিরপেক্ষ হলেও শিবাজী রচনাবলী বের হতে পারে ধারণা ছিল না। ভারতে কিন্তু ওর রচনাবলী প্রকাশিত হয়নি !

আতিথেয়তার দাপটে নাজেহাল হলেও এতদিন নাস্তানাবুদ হইনি। সে কাজটি সমাধান হল আজ ধানমণ্ডিতে শাহীদুল—জাহীদুল ইসলামের বাড়ীতে নৈশভোজে গিয়ে। শাহীদ ভাই বলেছিলেন, —আমরা যশোহরের মানুষ, অচিন্ত্যবাবুও যশোহরের, চিরঞ্জীব কাছেই খুলনার। দুডো ডাল ভাত খায়ে যাবে।' তদনুযায়ী অনুজ জাহীদকে ব্যবস্থা করতে বলেন। আবার দুপুরে শাহীদ ভাইয়ের পুত্র সাগরও আসে--চাচা রাত্রে যাবেন ত। না হলি আম্মা আমারে বকব্যানে।

খাওয়ার টেবিলে গিয়ে শুরুতে বুঝতে পারিনি। ডাল, মাছ ভাজা এল। তারপর আস্ত ইলিশ। ভাবলাম সবাই খাব ভাগ করে, অসুবিধা হবে না। কিন্তু ইলিশের আগমন বাড়তেই লাগল, তারপর মাংস। হ্যাঁ, যশোরের লোক, তাই কৈ মাছও ইয়া বড় বড়। এর

পর পুডিং, মিষ্টি। সবগুলোই কোনো রককে বুড়ি ছোঁয়ার মত খেলাম, তবুও অতিকষ্টে উঠে হাত ধুয়ে ইজিচেয়ারে গা এলাতে হল।

—একটু কফি হবে না? শুধোলেন জাহীদ।

—না কিসস্যু না, আধ ঘণ্টার মধ্যে কোনো কথাও নয়। গলা পর্যন্ত ভর্তি।

ওদের ড্রয়িং রুমে দুখানি মাত্র ফটো। রবীন্দ্রনাথের ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের। অতিকষ্টে ওগুলো অক্ষত রেখেছিলেন। মুক্তি যুদ্ধের সময় ওগুলো লুকোতে হয়েছিল। লুকোতে হয় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শেখ মুজিব, ফজলুল হক—সকলের ছবি। টানা হ্যাঁচড়ায় সব নষ্ট হয়ে যায়, অক্ষত থাকেন শুধু রবীন্দ্রনাথ আর নেতাজী। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য যেমন সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রবর্তন, তেমনি লক্ষ্যণীয় অধিকাংশ বাড়িতে আর কিছু না থাকুক রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না।

১৮ ফেব্রুয়ারী

কথা ছিল সকাল ৯টার মধ্যে রওনা হতে হবে কুমিল্লা। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থাও কুমিল্লায়। বাসে ঢাকা থেকে কুমিল্লা যেতে অন্ততঃ চার ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ ৯টায় রওনা হলে পৌঁছতে ১টা। কিন্তু বাস আসতে একটু দেরি হল। সকলের গুছিয়ে উঠতে আরও দেরি। 'পূর্বরাগ' হোটেল থেকে আমাদের খেলোয়াড়রা, 'পূর্বানী' হোটেল থেকে সালভি, অচিন্ত্য বাবু ও আমি এবং বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের তাদের ডেরা থেকে তুলে নিয়ে যাত্রা শুরু হল ঠিক সওয়া দশটায়।

আজ আবার ফেরির পর ফেরি। এত ফেরি না থাকলে বাসেই বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা কুমিল্লা পৌঁছতে পারতাম। তবুও ফেরি পার হতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কোথাও তেমন

'কিউ' ছিল না। তাছাড়া প্রতিবারই দেখি ফেরি লঞ্চ বা স্টিমারগুলি আমাদের দিকেই রয়েছে।

এতদিন কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, গানে এবং ভূগোলে শীতলক্ষ্যাকে চিনেছিলাম; আজ দেখলাম এই শীতের মরসুমেও শীতলক্ষ্যা কী বিরাট। এর আর চর নেই। পুরোটাই জলে পূর্ণ, গাঢ় নীল জল, মুখে চোখে দেওয়া যায় না। ভীষণ লবনাক্ত। জলে একবার পড়লে রক্ষা নেই। কিলবিল করে কামোটগুলো এগিয়ে এগিয়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে সাবাড় করবে।

এর পরে মেঘনার তীরে গিয়ে বাস থামলো। গোটা বাংলাদেশে কত ফেরি আছে সে হিসাব হয়ত তাদের সরকারী দফতরে আছে। কিন্তু এক কথায় তা অসংখ্য। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক, বাংলাদেশ যতই এগিয়ে থাক, এসব নদীতে নিশ্চয়ই ব্রীজ তৈরি করে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। হবেই বা কেমন করে, কোনো নদীরই মেজাজ বোঝা যায় না। শীতে ওরা শান্ত থাকলেও গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসতেই ওরা অশান্ত হয়ে ওঠে।

তাই বাংলাদেশের নদীগুলির আসলরূপ দেখার সৌভাগ্য এ যাত্রায় হল না। তবে প্লেন থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে একাধিকবার দেখেছি তাদের আঁকাবাঁকা পথ, কিছুটা উপলব্ধি করেছি তাদের গতি।

শীতলক্ষ্যা অপেক্ষা মেঘনা আরও গতিসম্পন্ন আরও গভীর, আরও ভয়ঙ্কর। ফেরিতে পার হয়ে কালুয়াকন্দি পৌঁছলাম। পাঁচমিনিট বাসে গিয়ে আবার মেঘনার ফেরি। এই জায়গাটা মজে গিয়েছে; আগে এখানে ব্রীজও ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় খান সেনারা এটি ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

আধঘণ্টার মধ্যে আবার বড় নদী, এবার এটি গোমতী। বেশ বড়। বাস থেকে নামতেই কিঞ্চিৎ হৈ চৈ। মানুষ সমান বিরাট আড়মাছ ধরা পড়েছে। তখনও সে লাফাচ্ছে। এই গোমতী পর্যন্ত ঢাকা জেলার সীমানা। ওপারে গেলেই কুমিল্লা জেলা শুরু। নদী

পার হয়েই ছোট সাইনবোর্ড দেখলাম—দাউদকান্দি স্টিমারঘাট। খানিক পরেই গৌরীপুর কলেজ, গৌরীপুর মাইক্রোওয়েভ সেণ্টার, রায়পুর ইত্যাদি। বড় পিচের রাস্তার দুধারে আধুনিক প্রথায় সেচ হচ্ছে পাম্প বসিয়ে।

ধান, আলু পাশাপাশি চাষ করা হচ্ছে। আরও এগোতে চান্দিনা মহকুমা।

একটা বেজে গিয়েছে খানিক আগে। সকালে ফেরিতে রওনা হওয়ার সু (?)ফল এবার বোঝা যাচ্ছে। সকলেরই পেটে রীতিমত খাবো খাবো অবস্থা। সওয়া একটায় কুমিল্লা ক্যাণ্টনমেণ্টের দেখা মিলতেই বুঝলাম—যাক এসে গিয়েছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাস থেকে নেমে পড়ব। স্নান সেরে আধঘণ্টার মধ্যেই লাঞ্চ। কিন্তু তা কী হয়? আমাদের বাস আগে গেল শহরে—কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। সকাল দশটা থেকে সেখানে শত শত ছেলেমেয়ে অপেক্ষা করছে, রয়েছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা, জেলা প্রশাসকবৃন্দ।

স্টেডিয়ামের সামনেই বিরাট তোরণ। দুই দেশের পতাকায় সজ্জিত তোরণের সামনে লেখা ‘স্বাগতম্, ভারতীয় কবাডি দল’। তোরণ অতিক্রম করে স্টেডিয়ামে ঢুকতেই একই পোশাকের কয়েকশত ছাত্রছাত্রী পতাকা নিয়ে, শ্লোগান দিয়ে স্বাগত জানাল দুই দেশের খেলোয়াড়দের। অতিরিক্ত জেলা শাসক আক্রার আহমদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার রশীদুল হাসান খাঁ স্বাগত জানালেন সকলকে।

আধ ঘণ্টার উপর কাটল। কুমিল্লায় এসে আমার মনে পড়ছিল কয়েকটি পুরনো কথা। প্রথমতঃ ঈশ্বর পাঠশালা, দ্বিতীয়ত অভয় আশ্রম, তৃতীয়ত ইউনাইটেড ব্যাংক, ময়নামতী যাদু ঘর এবং ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেণ্ট-এর কথা। তাছাড়া কুমিল্লা কিংবদন্তী হয়ে আছে ব্যাংক ও ট্যাঙ্কের শহর হিসাবে।

বাস চলল শহরের ছোট ছোট রাস্তা ঘুরে। হঠাৎ চোখে পড়ল ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার ছোট লাল বাড়িখানা। সুধীন দা,

ওরফে 'বিশ্বকর্মার' বই—'লক্ষ্মীর কৃপা লাভ ও বাঙালীর সাধনা'য় পড়েছিলাম ইউনাইটেড ব্যাংকের সৃষ্টি এই কুমিল্লায়। তার জন্মস্থান দেখলাম। অক্ষত সেই বাড়ি। ছোট সাইনবোর্ডও আছে। আমাদের বাস এগোচ্ছে। এবার বাঁদিকে দেওয়াল ঘেরা বিরাট টিনের ছাউনি দেওয়া লম্বা বাড়ি। মুখ বাড়াতেই সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে বাকি রইল না এটিই ঈশ্বর পাঠশালা। কত খ্যাতনামা ব্যক্তির কৈশোর কেটেছে এই স্কুলে। ভিতরে এখনও বহুদিনের সেই পুকুরটি রয়েছে।

বাস দ্রুত এগিয়ে চলল বাঁশ বাগান, পেঁপে, কলা ও পেয়ারা বাগান পেরিয়ে। কয়েকশ' একর জমি জুড়ে রুরাল ডেভেলপমেণ্ট ইনস্টিটিউটে। এখানকার গেষ্ট হাউসে থাকতে হবে। খাওয়াও ওদের ক্যানটিনে। স্নান সেরে ক্যানটিনের দিকে যেতে-যেতে শুনলাম বিভিন্নদেশের বিশেষজ্ঞরা গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণা বা জ্ঞান আহরণের জন্য এখানে আসেন। ভারতীয়রাও আছেন। সমগ্র এশিয়ায় এ ধরণের ইনস্টিটিউট আর নেই। শুধু কুমিল্লা জেলার অধিবাসীরা নন, সারা বাংলাদেশ এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে গর্ব করে। ছাত্রদের আকাসিক ব্যবস্থা। পৃথক ব্যবস্থা শিক্ষক ও অন্যান্যের। গ্রামময় বাংলাদেশের অধিকাংশ সিভিলিয়নকেও এখানে ট্রেনিং নিতে হয়।

বিকালে শালবন বিহারে ময়নামতি যাদুঘর দেখতে গেলাম। ছোট হলেও অনেক প্রাচীন সংগ্রহ রয়েছে এখানে। পোড়ামাটির নানা নিদর্শন। তালপাতায় বার্মিজ পাণ্ডুলিপি, ব্রোঞ্জের বুদ্ধ ও তারা মূর্তি, প্রাচীন সভ্যতার জম্বল মূর্তির নানা নিদর্শন। তাম্র শাসনের অক্ষর দেখে মনে হয় লেখাগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর হেরুক বৌদ্ধ মূর্তিও আছে।

যাদুঘরে আমাদের সঙ্গী কুমিল্লার তরুণ অতিরিক্ত জেলা শাসক (এ ডি সি) আর তাঁর ভাইঝি। চমৎকার মানুষ এই অফিসারটি। আগে বাড়ি ছিল কলকাতায় ও বর্ধমানে, ওঁর দাদু মহমেডান স্পোর্টিং

ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বর্ধমানের জমিদার। বর্ধমান শহরে তাঁর নামে রাস্তাও আছে।

তিনি আমাদের নিয়ে চললেন অদূরে মাটি খুঁড়ে পাওয়া অষ্টম শতাব্দীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। নালান্দায় দেখেছিলাম যেমন, তেমনি এখানেও। ক্লাসরুম, হোস্টেল, স্নানঘর কুয়ো সবই রয়েছে। গবেষণায় জানা গেছে, অষ্টম শতাব্দীতে ওখানে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা ওখানে ক্যান্টনমেণ্ট করতে গিয়ে মাটি খোঁড়ার সময় এটির সন্ধান পান।

বিশ্ববিদ্যালয় দেখার সময় এ ডি সি-র সালোয়ার ক্যামিজ পরা টুকটুকে পঞ্চদশী ভাইঝিটি সঙ্গে ছিল না। যাদুঘরে ফিরে দেখি বারান্দায় বসে সে গুণ্ গুণ্ করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে। থাকে ঢাকায়, স্কুলের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে চাচা-র কাছে। চমৎকার ছবি আঁকে, খেলাধূলাও ভীষণ ভালবাসে। কুমিল্লায় ত বটেই, ঢাকাতেও সে কবাডি খেলা দেখতে এসেছিল সবাইকে নিয়ে। দুদিনের মধ্যে আমিও ওর চাচা বনে গেলাম, মেয়েটি নেমন্তন্ন করেছিল—অন্ততঃ ঢাকায় ওদের বাড়িতে যেন যাই, ও যা পারবে নতুন চাচাকে রেঁধে খাওয়াবে। আমি ওর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে পারিনি। ঢাকা ছাড়ার আগে বলেছিলাম পরের বার এসে নিশ্চয়ই তোমার হাতের রান্না খাবো।

১৯শে ফেব্রুয়ারি

আজ চতুর্থ টেস্ট কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। খেলা নিয়ে ভাবনা খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজার প্রভৃতির। আমি শুধু সুযোগ খুঁজছি—যেখানে এলাম সেখানকার মানুষের সঙ্গে আরও মিশি, এদের কথা আরও জেনে নিই, পরে ত সুযোগ নাও হতে পারে। প্রস্তাবটি

ম্যানেজার অচিন্ত্যবাবুকে দিতে আরও কয়েকজন জুটে গেলেন—রাজি হলেন—এতবড় রুরাল ডেভেলপমেণ্ট ইনস্টিটিউট ভাল করে দেখে নিই। ডেপুটি ডিরেক্টর আজিজ খানের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে জানলাম, ১৯৫৯-এ স্থাপিত এই ইনস্টিটিউটে ফরেন সার্ভিসে নিযুক্তদেরও ট্রেনিং নিতে হয়। নানা ধরণের কোর্স আছে। কোর্সগুলি এক থেকে ছয় মাসের। বাংলাদেশ যোজনা কমিশন এখান থেকে ৪টি পাইলট প্রজেক্ট নিয়েছেন; এই ইনস্টিটিউটের পরিকল্পনাও ব্যাপক। তারা গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নানা পর্যায়ে ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট গড়ে তুলতে চান। ১৯৬৬তে পাকিস্তানী আমলে সরকার এদের কাছ থেকেই থানা পর্যায়ে সেচ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর এরা সমবায় আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছেন।

গোটা ইনস্টিটিউটটি ঘুরলে যে কোনো উন্নত দেশের সঙ্গে একে তুলনা করা যায়। আর তুলনীয় এখানকার ছাত্রছাত্রীরা। অসম্ভব নিয়মানুবর্তী।

ডিম আহারী নিরামিষ ভোজী আমাদের শেফ দ্য মিশন সালভি কুমিল্লায় খুব খুশি হলেন মনের মত খাদ্য পেয়ে। ব্রেকফাস্টে পেঁপে আর পনীর পেয়ে সালভি সপ্রসংশ হয়ে বলতে থাকেন, চিকেন, মাটন, মাছ—এর কাছে দাঁড়ায় না। তিনি আকণ্ঠ ভরে পেঁপে আর পনীর খেলেন সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। ছ টাকা কিলো পনীর। শুনতেও বিস্ময় জাগে না কি?

দুপুরে খাওয়া শেষ হতেই স্কাউট ননীদা বলে গেলেন, কবাডি উপলক্ষে সারা শহরে দারুণ সাড়া পড়েছে। টিকেট কাউণ্টারে

বিরাট লাইন পড়েছে। স্টেডিয়ামে ঢোকার সময় ওঁর কথার প্রমাণ পেলাম। খেলার আগে এখানেই একটি ব্যতিক্রমও ঘটল। ঢাকা যশোহর, ফরিদপুরে খেলা শুরুর আগে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজত টেপ রেকর্ডারে—এখানে তা নয়—স্থানীয় ছেলেমেয়েরা গাইল গান দুটি নিখুঁতভাবে এবং প্রমাণ দিল কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে তারা কত এগিয়ে।

কথা ছিল তথ্যমন্ত্রী জনাব তাহেরউদ্দীন ঠাকুর আজ প্রধান অতিথি হবেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি না আসায় প্রধান অতিথি হলেন সংসদ সদস্য জনাব খোশেদ আলি। সারা স্টেডিয়াম দুই দেশের পতাকা শোভিত। মাঠের মাঝেও বড় বড় দুটি পতাকা—একটি বাংলাদেশের অপরটি ভারতের।

আজ বাংলাদেশ দলে নামল—মকবুল হোসেন (কুষ্টিয়া), মহম্মদ সালেক (বরিশাল), রোস্তম আলি শেখ (ফরিদপুর), জাহাঙ্গীর আলম (কুমিল্লা), আমীর হাসেন (কুমিল্লা), জুলফিকর আলি (যশোহর) ও আবুল হোসেন, (বরিশাল)। অতিরিক্তরা ঢাকার আব্দুল রশীদ, বিল্লাল হোসেন ও সুবিমল দাস, রংপুরের আব্দুল কাদের বীর ও টাঙ্গাইলের মেশের খান।

ভারতীয় দলে খেলে—শেখর শেঠি, এম সুভান্না, বসন্ত সুদ, এম এস বিচারে, জয়দেব সাঁতরা, মহম্মদ এজাজুল্লা গৌরি ও সি এম পাতিল।

রেফারি—এম এ জলিল। আম্পায়ার—মধুসূদন দাস সরকার ও এস এম ওসমান গণি।

খেলার শুরুতেই বাংলাদেশ হানা নিয়েও হানাদার ধরে উপর্যুপরি দুটি পয়েণ্ট পায়। আমীর হোসেন হানা দিয়ে ও জুলফিকর হানাদার ধরে। এরপর জয়দেব সাঁতরা হানাদার ধরে ভারতকে প্রথম পয়েণ্ট দিল। ভারতের আক্রমণের কাছে বাংলাদেশ ছত্রভঙ্গ হতে থাকে নিজেদের ভুলে। তারা ভারতীয় হানাদার ধরতে যায় উত্তেজনার

বশে, এবং মারা পড়তে থাকে। ভারত ৪—৩, ৬—৩, ৭—৩ এগোবার পর লোনা পায় অর্থাৎ ১০—৩ হল। বাংলাদেশ এবার ব্যবধান কমাতে থাকে ৫—১০, ৬—১০, ৬—১১, ৭—১১-র সময় বিরতি হল। কুমিল্লার জাহাঙ্গীর নিজেদের মাঠে এদিন দারুণ খেলে দর্শকদের প্রশংসা কুড়োয়। কিন্তু শেষ দিকে উভয় দলের আত্মরক্ষা মূলক খেলা ও পোড়ামাটি পদ্ধতিতে দর্শকদের আনন্দে কিছুটা ভাঁটা দেখা দেয়। বিরতির পর বাংলাদেশ তিনটি পয়েন্ট সংগ্রহ করে, ভারত চারটি। অর্থাৎ সমাপ্তির সময় ভারত ১৪, বাংলাদেশ ১৩।

বাংলাদেশ হারলেও দর্শকরা গ্যালারি থেকে নেমে এসে তাদের অভিনন্দন জানালেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য। খেলা শেষে আবার বাসে। মাঝপথে বাস থামল একটি দোকানের সামনে। সেখানে বাঁশ ও কাঠের তৈরী নানা জিনিস, রয়েছে পাটের তৈরী অনেক কিছু। অমন হস্তশিল্প কলকাতায়ও পাওয়া যায় না। বাঁশ, পাট, কাঠ-নিপুন শিল্পীর হাতে পড়ে নানা রূপ নিয়েছে। যে যা পারলাম কিনে নিলাম। পাটের তৈরী কুমিল্লার কিছু ব্যাগের অনুকরণও কলকাতায় হয়েছে। কিন্তু বাঁশের হস্তশিল্প এখনও অননুকরণীয়। শুনলাম, বিদেশী পর্যটকদের কাছে ওই সব জিনিস বেশ আদরের।

সব কিছুই ত হল, কিন্তু কলকাতায় খবর পাঠানো ?
আগরতলা কুমিল্লা থেকে অনেক কাছে। একজন পরামর্শ দিলেন ভায়া আগরতলা কলকাতার ট্রাঙ্কলাইন চান, পেয়ে যাবেন। আজ এখান থেকে ঢাকা লাইন পাওয়া যাচ্ছেনা ভল্টেজ ড্রপ হওয়ায়। কখন ঠিক হবে কেউ জানেন না। আমি বললাম, কলকাতায় লাইনের দরকার নেই, তেমন হলে আগরতলায় আমাদের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমার মেসেজ ওখান থেকে টেলেক্সে কলকাতায় যাবে।

প্রথমে ঢাকা লাইন পাওয়ার চেষ্টা করলাম ইনষ্টিটিউটের অফিস থেকে। আধঘণ্টাতেও কোনো সাড়া না পেয়ে পি বি এক্স-এ গেলাম।

একই অবস্থা। ঢাকা লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। ঘণ্টা খানেক পরে যদিও বা পেলাম, তাও রিং হওয়ার পরে ওপ্রান্ত থেকে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল। আবার গলদঘর্ম অবস্থা। প্রতিদিন টি অ্যাণ্ড টি ডিরেক্টর শাহীতুল ইসলাম খবর নি'তন জয় পরাজয়ের, আজ ঢাকা থেকে তাঁরও কল আসছে না। সুতরাং ফোনের গোলমাল সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রইল না। সাত পাঁচ ভাবছি, কিন্তু ডায়াল করা থেকে বিরত হইনি। মাঝে মাঝে ঢাকা লাইন ঘোরাচ্ছি। হঠাৎ মিলে গেল—আর্কিমিডিসের 'ইউরেকা'র মত। রাত ৯টায় আমাদের ঢাকা অফিসের সাড়া পেলাম। তারপর চটপট পড়ে দিলাম পুরো স্টোরিটা। এদিকে ইনষ্টিটিউট হলে তখন বিচিত্রানুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

একে একে অনেকেই মঞ্চে উঠলেন। নাচ, গান স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা। বাংলা দেশের খেলোয়াড বিল্লাল হোসেন চমৎকার পল্লীগীতি পরিবেশন করল। ভারতীয়রা পিছিয়ে থাকবে কেন? নানা কথায় সাড়া দিয়ে এস এন সালভি মঞ্চে গিয়ে মীরার ভজন গাইলেন। কিন্তু হাসিয়ে পেটফাটাবার উপক্রম করল নিশাকর চক্রবর্তী। সে ব্যায়ামবিদ ও তোত্‌লার অভিনয় করল সিরাজের স্বপ্নের একটি লাইন নিয়ে। নিশাকরকে এতদিন দর্শকরা মাঠে না দেখলেও আজকের হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে গেল। ডিনার পার্টিতে সংসদ সদস্য খোশেদ আলি ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিশাকর তখন ওর আরও কয়েকটি স্টক ছাড়ল। বলল সেই হুলো বেড়ালের বাচ্চা মরার কাহিনী। ডিনারের পরে জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসন দু'দলের খেলোয়াড়দের স্মারক হিসাবে উপহার দিলেন বাঁশের ফুলদানী ও কাঠের ছইওলা নৌকো। বস্তুগত ভাবে উপহার গুলো ছিল কুমিল্লার হস্তশিল্পের সামান্য নিদর্শন। কিন্তু মাত্র দেড় দিনে ওখানকার আপামর জনসাধারণ যে প্রাণঢালা ভালবাসা দিলেন তার নজির নেই! ময়নামতি যাদুঘরের বুড়ো দারোয়ান, কিংবা

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের গাইড যখন শুনলেন—আমি কাগজের লোক, ইচ্ছে আছে ভারতে ফিরে তাঁদের কথা লেখার। চোখে যেন তখন উচ্ছ্বাসের রোল। আগের দিন গাইড বলেছিলেন—বিদেশী মানুষ অনেক আইছেন, কিন্তুক এমন তৃপ্তি পাই নাই। বন্ধুরাষ্ট্রের মানুষ আপনারা। স্বাধীন কইরা দিয়া কত উপকার যে করেছেন মুখে বুঝাই কেমন কইরা। মনডা আজ যেন কিছুডা হালকা হইল। গাইড বলেছিলেন—কী মনে হইত্যাছে জানেন ?

—কি ?

—না, বলুম না, আপনাগো ছোটো করা হইবে।

—বলুন না নির্ভয়ে।

—বুকে হাত রেখে বললেন, মনে হইত্যাছে লাখ টাকা কর্জর এক পাই শোধ করছি আইজ।

—স্বাধীন হইয়া খুশি হইছেন ?

—ভীষণ খুশি। জিনিষ পত্তরের দাম বাড়ছে ঠিকই। কিন্তুক্ কারোর অধীনে ত নাই। এয়ার চাইয়া বড় সুখ আছে বলেন ত। আপানাগো বড় দ্যাশ, অনেক আগে স্বাধীন হইছেন। কিন্তু কষ্ট কি নাই মানুষের ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম—আছে। বৃদ্ধ গাইডের দু চোখে বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় বললেন তিনি—সাহেব মনে কিছু করেন নাই ত!

গাইডকে টাকা দিতে গেলাম সবশেষে। তখন আর এক দৃশ্য। তিনি আরও অবাক করলেন—মন্‌ডা খোলসা হইয়া গেল। আমার ভীষণ আনন্দ হইতেছে। রাইখা ছান টায়া। ও লইয়া কদডুকু আনন্দ হয় ?

২০ ফেব্রুয়ারি

গত রাত্রেই বলা হয়েছিল আমরা সকলেই যেন ভোর ছটার মধ্যে প্রস্তুত থাকি। কেননা, সাড়ে ছটার মধ্যে কুমিল্লা বিমান বন্দরে পৌঁছতে হবে।

আজ আর বাসে নয়, বাংলাদেশ বিমানের ফার্ষ্ট ফ্লাইটে ঢাকা পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে বাসে টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইলে আজই খেলা—এটি অবশ্য টেস্ট নয়—প্রদর্শণী ম্যাচ। খেলা বাংলাদেশ কাবাডি-র সাংগঠনিক সম্পাদক এম এ হামজা-র জেলায়। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ ত বটেই।

ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ হলে কি হয়! ভোরে বেশ ঠাণ্ডা ছিল, কুয়াশাও চারিদিকে। আবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাসে উঠলাম। —বাংলাদেশ বিমানের বাসে চড়ে কুমিল্লা বিমান বন্দরের কাছে গিয়ে দেখি—চারিদিকে পুলিশ পাহারা। দিনে একবার এই বিমান ঘাঁটিতে যাত্রী বিমান যাতায়াত করে ঢাকার মধ্যে। ছোট বিমান বন্দর। যাত্রী বেশি হয় না। কিন্তু আজ 'ফুল'। এত সশস্ত্র পুলিশ ও প্যারা মিলিটারির ভিড় কেন? বিমান বন্দরে এক পদস্থ পুলিশ অফিসার জানালেন, প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা তোফায়েল আমেদ এখনই আসবেন। এই বিমানে তিনিও ঢাকা যাবেন। তাই এত নিরাপত্তার ব্যবস্থা। অথচ এর আগে ভাবছিলাম আমাদের জন্যই বুঝি এসব।

বিমান বন্দরে ছোট্ট ক্যানটিনের চা ও বিস্কুট খেয়ে সকলেই চাঙ্গা হয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে ঘণ্টা বেজে উঠল। ঢাকা থেকে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেন এসে পড়বে। নির্দিষ্ট সময় উৎসরে যাওয়া সত্বেও প্লেন আসেনি—খারাপ আবহাওয়ার জন্য—প্রচণ্ড কুয়াশা তাই।

মেঘ ফুঁড়ে কুয়াশা ভেদ করে বিমানটি আসার আগে বিরাট

কনভয় এল। আওয়ামী লীগের যুব ও ছাত্র শাখার সদস্যরা এলেন, এলেন তোফায়েল আমেদ। বিমান ঘাঁটিতে দুইদল খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তোফায়েল আমেদ খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বললেন, রাজনৈতিক কর্মী বা নেতাদের অপেক্ষা আপনারা অনেক বড়। দুই দেশের ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্যকে আপনারাই আরও দৃঢ় করতে পারেন।

কুমিল্লা-ঢাকা বা ঢাকা-কুমিল্লা বিমান পথে মাত্র ১৬ মিনিট লাগে। ভাড়া ২০ টাকা, তেলের দাম বাড়ায় ৫ টাকা ভাড়া বেড়েছে, আগে ছিল ১৫ টাকা। বাসে কত লাগে জানিনা। তবে কুমিল্লা-ঢাকাই নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে শস্তা এয়ার রুট। যাদের মাঝে পথে দরকার নেই, তারা বাসে কেন ফেরির পর ফেরির ধকল আর ধূলো সহ্য করে কুমিল্লা থেকে ঢাকা বা ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাবেন। উড়োজাহাজে চড়াও হল, আরামে দ্রুত পৌঁছানও গেল।

বিমানে উঠেই খবরের কাগজ পেলাম। ইত্তেফাক ও বাংলার বাণী আজও বড় বড় শিরোনামায় কবাডি কভার করেছে। তাদের বুধবারের বিশেষ খেলার পাতাটি কবাডিতে পূর্ণ। টেলিভিশন, বেতার, সংবাদপত্র—তিনটি প্রচার মাধ্যমে শুধু কবাডি আর কবাডি। ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সাহিত্য সম্মেলনকেও চাপা দিয়েছে এই কবাডি।

আজ বিমানে আমার পাশের আসনে ছিল বাংলাদেশের সেরা খেলোয়াড় জাহাঙ্গীর আলম। চমৎকার ছেলে। বয়স ৩২। সোনালী ব্যাংকের সহকারী ক্যাশিয়ার। উচ্চতা ছয় ফুট। দোহারা এই এই শ্যামলা তরুণের বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দি। '৬৯ থেকে ভলিবল খেলছে এবং' ৭০-এ কবাডিতে পাকিস্তানের জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পূর্বপাকিস্তান দলে ছিল। '৭১-এ রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় ভলিবলও খেলে। '৭৩এ দিল্লিতে গ্রামীণ ক্রীড়ায় বাংলাদেশ দলের পক্ষেও ভলিবল খেলেছে। জাহাঙ্গীর কবাডিও খেলছে '৬৯ থেকে। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় কবাডি প্রতিযোগিতায় ('৭৭)

তার নেতৃত্বে কুমিল্লা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সে ঢাকার সিনিয়র ডিভিশন ফুটবলে উয়াড়ির রাইট ব্যাক।

জাহাঙ্গীরের সঙ্গে আলোচনা শেষ না হতেই ককপিটের গায়ে আলো জ্বলে উঠল। কোমরের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে জানলা দিয়ে তাকাতেই ঢাকা শহর চোখে পড়ল। পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা বিমান পথের যাত্রা শেষ।

ঢাকায় থেমেই আজ আর হোটেলে নয়। চলে যেতে হবে টাঙ্গাইলে। তবে তার আগে এয়ারপোর্টে ব্রেকফাষ্ট করার কথা। আগেই স্থির ছিল 'ইত্তেফাক'-এর ক্রীড়াবিভাগের ভারপ্রাপ্ত বদিউজ্জামান আমাদের সঙ্গেই টাঙ্গাইল যাবেন ম্যাচ কভার করতে। দোতালায় এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে ব্রেকফাষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু দেখা মিলল না বাসের। এল একঘণ্টা পরে।

লক্ষ্য টাঙ্গাইল। ঢাকা থেকে ৬০ মাইল বাসে অভিযান। রাস্তা মোটামুটি ভাল হলেও মাঝে মাঝে ধুলোর পাহাড়। একঘণ্টা দেরী মেক আপ করতে বাস প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলল। সওয়া এক ঘণ্টার মধ্যে ৪২ মাইল পথ যাওয়ার পর মির্জাপুরে বাস বাঁদিকে ঘুরল। আমাদের ভ্রমণসূচীতে মির্জাপুরের হাসপাতাল ও বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে।

মির্জাপুর শহর নয়, হাসপাতাল ও স্কুল ঘিরে ছোট শহর গড়ে উঠেছে গাঁয়ের মধ্যে। টেলিফোন, লাইট, পিচের রাস্তা—কি নেই!

বাস থেকে নেমে এনকোয়ারি অফিসে বসে হাসপাতালের ভিতরে গেলাম সামান্য সময়ের জন্য। কলকাতায় ত কত হাসপাতাল আছে। মেডিকেল কলেজ, আর জি কর, নীলরতন সরকার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সুকলাল কারনানি (পি জি) প্রভৃতি। কিন্তু পরিচ্ছন্নতায় ওরা কেউ মির্জাপুরে সাহাদের স্থাপিত এই হাসপাতালের ধারে ঘেঁষতে পারবে না। আধুনিক হাসপাতালের সবকিছু ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে। আউটডোর বিভাগও চমৎকার। প্রতিষ্ঠা থেকে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে

এটি চলছে, অবশ্য সরকারী সাহায্যও মেলে। তবে অধিকাংশ অর্থ আসে সাহাদের নানা ব্যবসা থেকে। জনসাধারণের সেবার এমন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিরল।

হাসপাতাল পার হতেই বিরাট গেট দিয়ে ঢুকলাম সাহা পরিবার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের চত্বরে। এমন বিরাট এলাকা ও বাড়ির এমই স্কুল কখনো দেখিনি। কেজি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। ১২০০ ছাত্রীই থাকে স্কুলের হোস্টেলে। কী এলাহি ব্যাপার।

ছোট ছোট মেয়েরা সামরিক কায়দায় আমাদের অভিনন্দন জানাল কুচকাওয়াজ করে। অমন মার্চ মিলিটারি ছাড়া আর কারুর দেখিনি। মার্চ করতে করতে বাংলদেশের মানচিত্র তৈরী করল নিজেদের দিয়ে। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল ওদের স্মার্টনেসে। বাঙালী মুসলমান মেয়েরাও কত এগিয়ে গেছে মির্জাপুরের এই স্কুলই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়, তারা আধুনিকতম সব শিক্ষা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের এই ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন স্কুল থেকে। যে সমস্ত গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলমান আজও চান মেয়েরা শুধু অন্তঃপুরেই থাকুক—মির্জাপুরের এই স্কুল তাদের সামনে নতুন জগৎ খুলে দেবে।

কথা ছিল বংলাদেশ ও ভারতীয় কবাডি খেলোয়াড়রা ওখানে কিছু খেলা দেখাবে—যাতে ওরা কবাডি রপ্ত করতে পারে। কিন্তু সময় খুব অল্প। তাই তা হল না। অবশ্য সময় আরও আধঘণ্টা চলে গেল স্কুলের লাইব্রেরিতে গিয়ে। অতিথিদের ওর জলপান করাবেই। শিক্ষিকাদের চাইতে এ ব্যাপারে ছাত্রীরা অগ্রণী। অগ্রণী বললেও ভুল হবে। ক্যানটিন চালায় নিজেরাই। নিজেদের তৈরি খাবার দিল আমাদের। খাদ্যের চাইতে আমার বেশি মন ছিল গ্রন্থাগারের বিরাট সংগ্রহের দিকে। গ্রন্থাগারে মাটির বিরাট সরস্বতী প্রতিমা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের বিরাট অয়েল পেন্টিং। প্রত্যেক পড়ুয়ার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত। বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার এখানে। এমন জায়গায় কার না পড়াশুনা করতে ইচ্ছে হয়। ওই হল থেকে বাইরে

স্কুলের মাঠে বের হলে আবার অন্য পরিবেশ। মনে হবে এরা শুধু খেলাধূলাই করে।

আরও কিছুক্ষণ নয়—কয়েকদিন কাটাতে ইচ্ছে করছিল অমন পরিবেশে। কিন্তু গতির নিশায় তা কী হয়? বাস ছুটে চলল টাঙ্গাইলের দিকে। অশোকপুরে পৌঁছতেই রাস্তার ধারে সাদা একতলা বাড়ি দেখিয়ে সাহেব আলি বললেন, এটি ম্যাজিসিয়ান পি সি সরকারের বাড়ি। ওঁর ছেলে জুনিয়র পি সি সরকার কিছুদিন আগে ঢাকায় 'ইন্দ্রজাল' দেখাবার পরে এখানে এসেছিলেন। ওই বাড়ির বাসিন্দারা তাঁকে বলেন, "আপনারা আসুন, আমরা বাড়ি ছেড়ে দেব। আপনারা ত আমাদের গর্ব!"

বাংলাদেশ কবাডির সাংগঠনিক সম্পাদক এম এ হামজার জেলা টাঙ্গাইলে পৌঁছলাম ১২ টার পরে। আগে যেখানে নদী ছিল, এখন তারই বুকে নতুন জেলার নতুন জেলাশহর গড়ে উঠেছে।

গেস্ট হাউসে স্নান খাওয়া সারতেই হামজা ভাইয়ের সঙ্গী হতে হল। 'চলেন টাঙ্গাইলের শাড়ি দেইখা আসি।' টাঙ্গাইলের কাপড়ের নাম শুনেছি, চোখে দেখিনি। এ সুযোগ কী ছাড়া যায়? সরু রাস্তা দিয়ে টাঙ্গাইল বাজারে কাপড় পট্টিতে ঢুকলাম। শাড়ির গুণাগুন সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই কম। সঙ্গী অচিন্ত্যবাবু ও চিরকুমার সালভি। সালভিকে রং চং-এ চার খানা শাড়ি কিনতে দেখে অবাক হলাম। কোচ্ ওয়ালঞ্জ পরে জানান, পঞ্চাশটি বসন্ত পার হওয়ার পর ওঁর বিয়ের ফুল ফুটতে চলেছে। এবার আমরা একটা 'ভাবী' পেতে পারি। দোকানে গিয়ে কলকাতার টাঙ্গাইলের শাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। ওঁরা জানালেন, এখানকার কাপড় কলকাতায় কিছু কিছু পাবেন। তবে কলকাতার অধিকাংশ টাঙ্গাইলের শাড়ি ভারতেই তৈরি। আমাদের মত এমন বুনন বা এত সূতোর কাপড় পাবেন না। বললাম, তা হলে ওগুলো শিয়ালদহে তৈরি জয়নগরের মোয়ার মত। বাংলা না বোঝা সালভি আমার দিকে

তাকিয়ে রেগে বললেন, "আচ্ছা, রিপোর্টার, তোম্ হামারা পিছু লাগত্যা হ্যায় কেঁও!" আমরা হাসি চাপতে পারিনি।

সওদা করতে করতে একটু দেরি হল। এদিকে খেলার সময় হয়ে যাচ্ছে। গেস্ট হাউসে ফিরেই বাক্স-পেঁটরা নিয়ে আবার যাত্রা। মাইল দুয়েক দূরে মাঠ। আজ সেখানেই টাঙ্গাইল বনাম ভারতীয় দলের প্রথম প্রদর্শনী ম্যাচ।

টাঙ্গাইলের বিরাট মাঠটিকে এই খেলার জন্য ঘিরে ফেলা হয়। কড়া পুলিশ বেষ্টনী, তবুও জনতার বন্যা রোখা যায়নি। গ্যালারি না থাকাতেই সবচেয়ে অসুবিধা হয়। কিন্তু আজ বাংলাদেশের দর্শকরা সবচেয়ে আনন্দ পান।

টাঙ্গাইল দলে খেলল—মহঃ সালেক, আলি হোসেন, মেশের খান, রসীদ, হায়দার আলি, কাদের বীর ও সুবিমল দাস।

ভারতীয় দলে—সুভান্না, বিচারে, জয়দেব সাঁতরা, এজাজুল্লা, বিজয় দাস, নিশাকর চক্রবর্তী, পাতিল, কোটেশ্বর রাও ও এ বিশ্বনাথন।

রেফারি—এম এ' হামজা। আম্পায়ার—ওসমান গণি ও মধুসূদন দাস সরকার।

২১ ফেব্রুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকায় এই খেলা সম্পর্কে আমার পাঠানো রিপোর্টটি হুবহু তুলে দিলাম—

টাঙ্গাইলে ভারতীয় কবাডি দল হেরে গেল—এই ছিল হেডিং।

টাঙ্গাইল, ২০ ফেব্রুয়ারি—বাংলাদেশে কবাডি খেলতে এসে ভারতীয় দলের প্রথম পরাজয় ঘটল টাঙ্গাইলের মাঠে। প্রথম প্রদর্শনী খেলায় তারা হারল বাংলাদেশ জাতীয় দলের কয়েকজনকে নিয়ে গড়া টাঙ্গাইলের তরুণ দলের সঙ্গে।

টাঙ্গাইল জিতেছে ৩০—১৭ পয়েনটে। তারা দুটি লোনা পেয়েছে। বিরতির আগে টাঙ্গাইল এগিয়েছিল ১৬—৭ পয়েনটে।

ভারতকে হারিয়েছে আজ টাঙ্গাইলের অধিনায়ক মহম্মদ সালেকের পরিকল্পনা ও দল পরিচালনা। বলা বাহুল্য দলকে সে ১৫ পয়েনট

উপহার দিয়েছে। এর মধ্যে ১১ পয়েনট হানাদার ধরে।. এক সময়ে ভারতের কোর্টে মাত্র তিনজন বেঁচে ছিল। কিন্তু ধৈর্য না হারিয়ে এবং দ্রুত লোনার জন্য ঝুঁকি না নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করেছে এবং যথাসময়ে পয়েনট এসেছে। ভারত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য খেলোয়াড় বদল করেও টাঙ্গাইলকে পিছনে ফেলতে পারেনি। অবশ্য তাদের দলে কিছু ভাল খেলোয়াড়কে নামানো হয়নি এটি টেস্ট নয় তাই। খেলেনি অধিনায়ক শেখর শেঠি ও বসন্ত সুদ।

আজ ভারতীয় দল প্রথম পয়েনট সংগ্রহ করে টাঙ্গাইলের যখন ছয়। তাদের লোনার সময়েও ভারতের এক। ভারত এক সময়ে কোল চড়াইয়ে টাঙ্গাইলের তরুণদের চেপে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ফল পাওয়া গেল না।

শেষ মুহূর্তের পাঁচ মিনিটে উভয় দল দ্রুত পয়েনট করতে থাকে। হাজার হাজার দর্শক তখন দারুণ উত্তেজনায় ভুগছেন। শেষ পয়েণ্টটি আনে অধিনায়ক সালেক হানা দিয়ে। শেষ বাঁশি যখন বাজলো টাঙ্গাইলের খেলোয়াড়রা তখন দর্শকদের মাথায়।

আজ খেলার উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান। জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখি সাংগঠনিক সম্পাদক হামজা ভাইও দর্শকদের কাঁধে। নাচছে ঢাকা থেকে আশা আমার শটগান—জাহীদুল ইসলামও। সাংবাদিক বদিউজ্জামাকালকে বললাম, আজ আপনার কাগজে বড় হেডিং চাই। আমিও কলকাতায় ডেসপ্যাচ পাঠাবো এদের প্রশংসা করে। সত্যিই গর্বের কথা। আধুনিক কবাডি সম্পর্কে চোস্ত যে ভারতীয় দলকে বাংলাদেশের জাতীয় দল হারাতে পারেনি, তারা অবশেষে হারল টাঙ্গাইলের স্থানীয় খেলোয়াড়দের কাছে।

খেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গে জাহীদুল ইসলামের স্মরণ নিলাম। ফেরার সময়ে বাসে নয়, তাহলে দেরী হতে পারে। জাহীদের 'টয়োটায়' উঠে পড়লাম ইত্তেফাকের বদিউজ্জমান ও আমি। সঙ্গে আরও একজন।

তিনি জাহীদেরই বন্ধু, এই ক'দিনে আমারও দোস্ত। চমৎকার ছবি তোলেন এই কে এম মাহমুদ। আমাদের নিয়ে জাহীদের গাড়ি ছুটলো আবার টাঙ্গাইল বাজারে। এবার শাড়ির জন্য নয়—মিষ্টির দোকানে। টাঙ্গাইল জেতায় অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের আহ্বায়ক জাহীদ পেট পুরে মিষ্টি খাওয়াবেন আমাদের। কিন্তু আড়াইশ' গ্রাম ওজনের দুটো চম্‌চম্‌ মুখে পুরে আর খেতে পারলাম না। প্রামত দুপুরে খাওয়াটা দেরিতে হয়েছিল, তদুপরি টাঙ্গাইলের চম্‌চমে কোনো ভেজাল নেই। এবং ভীষণ মিষ্টি। আমাদের পিছু পিছু আরও অনেকে হাজির হলেন ওই দোকানে। তারাও পীড়াপীড়ি করছেন—খেতেই হবে। অবশেষে জাহীদের গাড়িতে পালিয়ে বাঁচলাম। জাহীদের হাতে স্টিয়ারিং। নতুন হাই ওয়েতে পড়ে সে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে আমরা ঢাকায় পৌঁছলাম।

কলকাতায় খবর পাঠিয়ে ঢাকা শহরে বেরুলাম। আজ ঢাকা নতুন রূপ নিয়েছে। ২০শে ফেব্রুয়ারির রাতে প্রতিবছরই এখন ঢাকার অন্য মেজাজ। আজ রাত বারোটার পর থেকে শুরু হবে অমর ২১শে ফেব্রুয়ারির উৎসব।

এমন উৎসব বাংলাদেশে আর নেই। মাতৃভাষাকে ঘিরে এমন জাতীয় উৎসব পৃথিবীর আরও কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। দুই দশকের বেশি আগে এমনি দিনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যারা প্রাণ দিয়েছিল, রক্ত দিয়েছিল—তাদের স্মরণে এই জাতীয় উৎসব চলে আসছে সারা বাংলাদেশে। শুধু ঢাকায় নয়, এখন প্রতিটি শহরে, নগরে গড়ে উঠেছে ঢাকারই অনুরূপ শহীদ মিনার। দেশময় সকলে এদিনে কালো ব্যাজ পরে থাকেন। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, বালক, নির্বিশেষে শহীদ মিনারে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। সারা দেশে এই দিনের স্মরণে কত পুস্তিকা, বই, পত্রিকা বের হয় তার ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকা ২০,

৪০, ৫০ পৃষ্ঠার ক্রোড় পত্র বের করে। সবচেয়ে বড় উৎসব হয় ঢাকায় এবং তা শহীদ মিনারের পাদদেশে।

২০ ফেব্রুয়ারি রাত বারোটার পর থেকে সেখানকার অনুষ্ঠান শুরু হয়। আর তা রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয় সরাসরি। এমন উৎসবে এখন কিংবদন্তী। শুধু কী তাই? ব্যক্তিগতভাবে আমারও ভাষা যে ঐ বাংলা। জন্মমুহূর্তেই ওই ভাষাতেই 'মা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, আবার কাঁদা হাসা সাঙ্গ হলে ওই ভাষাতেই 'হরিবোল' শুনতে হবে।

রাত্রে শুনলাম, সূর্যোদয়ের আগেই শুধু নয়, রাতের অন্ধকারে শহীদ মিনারে না গেলে কিছুই দেখা যাবে না। মিনারের কাছে পৌঁছানোও অসম্ভব হবে। অচিন্ত্যবাবু বললেন, কবাডি দলও যাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। তা হলে, কোনো কথাই নেই। সকালে এক সঙ্গেই যাবো।

ঢাকা শহর এরাত্রে ঘুমোয় নি। আমারও ঘুম হল না। 'পূর্বাণী'র জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে মাঝে মাঝে তাকাতেই দেখি ছোট, বড় মিছিল যাচ্ছে। সকলের লক্ষ্য এই শহীদ মিনার। অচিন্ত্যবাবুকে জাগিয়ে পাশে 'পূর্বরাগ' হোটেলে খেলোয়াড়দের ডেরায় ফোন করতে বললাম। হুড়মুড়িয়ে তারাও উঠে এল। তখনও রাতের আঁধার কাটেনি। ওরা ব্লেজার পরে। বুকে কালো ব্যাজ, খালি পা। অচিন্ত্যবাবু আগেই মালার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। খেলোয়াড়রা সেটি বয়ে নিয়ে চলল। আধঘণ্টা হেঁটে পৌঁছে গেলাম শহীদ মিনারের কাছে। আজ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রিত। শহীদ মিনারের কাছে ত নয়-ই। আধ মাইলের বেশি দূর থেকেই জনসাধারণের চলাচলও নিয়ন্ত্রিত। সবচেয়ে বড় কথা পুলিশ নেই কাছাকাছি। সবাই আজ স্বেচ্ছাসেবক। কোথাও ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি নেই। তবুও মনে

হল এগোন অসম্ভব। সামনে প্রচণ্ড ভিড়। হাজার হাজার মানুষ শহীদ মিনারের চতুর্দ্দিকে। কিন্তু কোনো অসুবিধা হল না। ভারতীয় কবাডি দলের ব্লেজার ওঁদের চোখে পড়তেই যেন আপনা আপনি পথ হয়ে গেল। এগিয়ে চললাম, ফুল দিলাম, নীরবে অমর শহীদদের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। রেডিও, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের ডাকে এগিয়ে গেলেন ম্যানেজার অচিন্ত্যবাবু। তাঁদের অনুরোধে বললেন, কী ভাবে আমাদের অভিভূত করেছে এই অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। শহীদ মিনারের পাদদেশে ফুলের পাহাড়। অথচ ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গানে গানে মুখর গোটা এলাকা। কেউবা আবৃত্তি করছেন। ছোট সভাও এদিক ওদিক। নানা ধরণের পোষ্টার, ফেস্টুন। সব কিছুর উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য ওই বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা।

এর আগে মন্দিরে গিয়েছি, গিয়েছি গির্জায়, মসজিদে, গুরুদ্বারে, বৌদ্ধবিহারে। গিয়েছি গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে, সাগর মেলায় কিন্তু এমন তীর্থদর্শন কখনও হয়নি। বরকত, সালাম কত মহান! আল্লা বা ঈশ্বরের অনেক আপনজন ওঁরা। তাই ওদের কাছে টেনে নিয়েছেন। ওঁরা ভাগ্যবান। ওঁরা মুখের ভাষার জন্য বুকের রুধির দিয়েছেন। শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে ওঁদের উদ্দেশ্য হাজারো বা লাখো সেলাম জানাতে চাইনি। কেননা তাতে ওঁদের যে খাটো করা হবে। পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থণা করছিলাম—আমাদের এমন শক্তি দাও, যা দিয়ে ওদের আরব্ধ কাজ শেষ করতে পারি—যার দ্বারা বাংলা ভাষা আরও মর্যাদা পায়।

আজ শহীদ মিনারে গিয়ে যেমন আনন্দ পেলাম, আর কোথাও কখনও তা পাইনি। পাইনি সাগর মেলায়, পাহাড়ের চূড়ায়ও। শরীর, মন এমন রোমাঞ্চিত হয়নি কখনও। আজ আমার বাংলাদেশ দেখা সম্পূর্ণ হল। বাংলাদেশে এসে যিনি নদীগুলিকে দেখেননি, এবং দেখেন নি একুশে ফেব্রুয়ারিকে, তাঁর বাংলাদেশ দেখা অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে।

শহীদ মিনার থেকে হেঁটে ফেরার পথেও আমার তন্দ্রা কাটেনি। হোটেলে ফিরে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটি টেলিফোন সব ঘোর কাটালো। "আপনাগো দেখলাম, অচিন্ত্য চাচা—সব খেলোয়াড়।"
ও প্রান্ত থেকে শাহীদ ভাইয়ের ছেলে সাগরের কণ্ঠ।

—কোথায়? কই ডাকলে না তো! তাছাড়া ওখানে ত কোনো গাড়ি যেতে দিচ্ছে না। কখন গেলে তোমরা?

—আমি যাই নাই ওখানে।

—তবে কেমন করে দেখলে?

—টেলিভিশনে। প্রায় পনের মিনিট ধইরা আপনাদের প্রোগ্রাম দেখাইল। আপনাদের যাওয়া, ওখানে দাঁড়ান, চলে আসা সব দেখাইছে।

টেলিভিশনের ওই প্রোগ্রামের পর ভারতীয় খেলোয়াড় সহ আমাদেরও ভীষণ বিপদে পড়তে হল। ঢাকার রাস্তায় বের হলেই নানান জনের নানা প্রশ্ন। দু মিনিট কথা বলতেই হবে। কিংবা মিষ্টি বা চা, ঠাণ্ডা পানীয় এসে যেতে থাকে। এমন অবস্থা হতে লাগল যে টেলিভিশনের এক বন্ধুকে বাধ্য হয়ে বললাম, ভাই সেদিন কাজটা খুব ভাল করেন নাই।

সময় হয়ে যাচ্ছে। ম্যানেজার তাড়া দিলেন। আবার তল্পিতল্পা গোছাতে হবে। পৌনে একটায় প্লেন ছাড়বে। দিনাজপুর যেতে হবে। কাল ২২ তারিখে সেখানে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট।

আবার তেজগাঁও বিমানবন্দর। আজ অনেক সময় প্লেনে থাকতে হবে। ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁও পৌঁছতে প্লেনে পুরো একঘণ্টা লাগবে। বাংলাদেশে আভ্যন্তরীন বিমান পরিবহনের এটিই দীর্ঘতম রুট। আজ আমাদের সঙ্গী শুধু বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা এবং সঙ্গে রয়েছেন সংসদ সদস্য নূর আহম্মদ চৌধুরী ওরফে কালুভাই, বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলি। এবং ভারতীয় হাই কমিশনের মৈত্রবাবু।

আজ বিমান থেকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল দেখে নিলাম। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রকেও স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল। দেখলাম শীতে এদের চেহারা কিছুটা শীর্ণকায়—বালি জেগে ওঠায়। ককপিটে যেতেই পাইলট বলেছিলেন, আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখতে পাবেন। কিন্তু মেঘের বাধায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা হল না।

ঠাকুরগাঁওয়ে নামার আগেই পিঁপড়ের চেহারার অসংখ্য মানুষ চোখে পড়ল। বিমানবন্দরের কাছাকাছি তেমন জনবসতি নেই। ওরা এসেছেন দূর দূর গ্রাম থেকে কবাডি দলকে অভ্যর্থনা জানাতে। পৌনে একটায় আমাদের বিমান ঠাকুরগাঁওয়ের মাটি স্পর্শ করল।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই ফুলের মালার পর মালা। পরিচয় পর্ব শেষে আবার বাসে উঠলাম। আমাদের গন্তব্যস্থল দিনাজপুরে। ৮০ মাইলের উপর বাসে যেতে হবে। আমাদের আগে চললেন শিক্ষামন্ত্রী। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য—এদিকে নদী অনেক কম। আজ আমাদের আর ফেরি পার হতে হল না।

দিনাজপুর পৌঁছলাম সওয়া তিনটায়। ডাক বাংলোয় আমাদের জায়গা। ছোট্ট শহরে চমৎকার বন্দোবস্ত। স্থানীয় তরুণ কর্মীরা সব ব্যবস্থা করে রাখলেও অধ্যাপক ইউসুফ আলি আর কালুভাই আমাদের প্রত্যেককে ঘরে পৌঁছে দিয়ে তবে ডাকবাংলো ত্যাগ করলেন।

'মেহমান্'দের অযত্ন না হয়, তাই প্রত্যেকের কাছে পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করে গেলেন স্থানীয় যুবকবৃন্দ। শেফ দ্য মিশন সালভি ছিলেন অন্য একটি বাড়িতে। হঠাৎ তাঁর দেখা। "এই রিপোর্টার, তোমারা ত বহুৎ দোস্ত হায় ইধার উধার। 'অম্রুত' মিলেগা ইধার।" আমি কিন্তু আগেই খেজুর রসের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম। তবে কালুভাই বললেন, যশোরের মত মিষ্টি এবং সুগন্ধি রস আর কোথাও মিলবে না। সন্ধ্যার আগেই 'অম্রুত' অর্থাৎ খেজুর রস এসে গেল। সালভি এক গ্লাস খেয়ে আর এক গ্লাস চাইলেন।

—"জিন্দেগী মে এইস্যা ড্রিংস নেই পিয়া। দেখো ভগওয়ানকা ক্যায়সা অপূর্ব সৃষ্টি।"

—কী আর এক গ্লাস চাই নাকি সাহেব। নিশাকরের জিজ্ঞাসার আগেই সালভি গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—থোড়া নিকালো।

ভোররাত্রে শহীদ মিনার এবং সারাদিনের জার্নিতে সকলে ক্লান্ত। কিন্তু কিছু খবর ত পাঠাতে হবে! অনেক চেষ্টা করলাম ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের, এখানেও সরাসরি ডায়ালিং-এ লাইন পাওয়া যায়। কিন্তু কুমিল্লার মত ভল্টেজ ডাউন থাকায় কিছুতেই কিছু করা গেল না। একজন পরামর্শ দিলেন সার্কিট হাউসে গিয়ে বরং ওপারে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি বা রায়গঞ্জের লাইন চেষ্টা করুন, পেতে পারেন। দিনাজপুরের মশার দাপটে সার্কিট হাউসে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলাম না। ওদিকে চোখও বুজে আসছে ঘুমে।

ডাকবাংলোয় ফিরে তাড়াতাড়ি ঘুমোবার চেষ্টা করেও হল না নিশাকরের পেট ফাটনো নানা গল্পের দাপটে।

২২ ফেব্রুয়ারি

ভোর হওয়ার আগেই ঘুম ভাঙল স্টেশনের রেল ইঞ্জিনের পুঁ-উ-উ আর মালগাড়ির শান্টিংএর শব্দে। ডাক বাংলোর একটু দূর দিয়েই রেল লাইন চলে গিয়েছে। অনেকেই তখন জেগে গিয়েছেন। কেউ কেউ বেড-টি-এর জন্য ব্যস্ত। কিন্তু অধিকাংশের লক্ষ্য রাস্তার দিকে খেজুর রসওয়ালা কখন আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যে সালভিও ছুটতে ছুটতে হাজির—অ্যাই রিপোর্টার, সব অম্রুত ফিনিশ্ কর দিয়া।

নিশাকর বলল, আপকা বহুৎ দেরি হোগিয়া। ইধার পাঁচকো অন্দর মে অম্রুত ফিনিশ হো যাতা হ্যায়। এ বাংলাদেশকা উত্তরবঙ্গ তো।

ব্রেকফাস্টের পরে বেড়াতে যাওয়া ঠিক হল মাইল পাঁচেক দূরে রামসাগরে। শুরকির রাস্তা দিয়ে বাসে যেতে যেতে শুনলাম, মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে ভারতীয় বাহিনীর শিবির ছিল। তা ছাড়া রামসাগর থেকে আর মাইল পাঁচেক গেলে ভারত সীমান্ত।

রামসাগর কৃত্রিম হ্রদ। আয়তন চার বর্গমাইল। দিনাজপুরে এটাই পিকনিকের চমৎকার জায়গা। রামসাগরের একদিকে পাকা বাড়ি আছে। ঘর ভাড়া করে সেখানে রান্না করুন, বিশ্রাম করুন। আমরাও দেখলাম অনেকে সপরিবারে গিয়েছেন পিকনিক করতে। রান্নার গন্ধে জিভে জল আসছিল। সময় থাকলে আমরাও হয়ত 'ছ্যাক কল কলে'র আয়োজন করতাম কেয়ারটেকারের ব্যবস্থাপনায়। ওখানে আমাদের জন্য চা হল।

বাংলাদেশ সফর শেষ হতে চলেছে। তবে একটি বিষয়ে একেবারে উল্লেখ করা হয়নি। সালভির খাওয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছি, কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ এই শেফ দ্য মিশন-এর মেয়েদের প্রতি একটু বিশেষ দুর্বলতা দেখেছি সর্বত্র। কুমিল্লায় এ ডি সি-র ভাইঝির ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং বন্ধুত্ব বেশ লক্ষণীয় ছিল। ঢাকায় এসেও ওদের ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন। আর এক ব্যতিক্রম জয়দেব সাঁতরা। জয়দেব, নিশাকরের প্রতিবেশী—চন্দননগরের বাসিন্দা। লাল্টু লাল্টু চেহারার জয়দেবকে দেখে এবং বাঙালী জেনে বাংলাদেশের মহিলা মহলকে মাঝে মাঝে বেশ প্রীত হতে দেখেছি। দিনাজপুরে রামসাগরের তীরেও দেখি জয়দেব পনের মিনিটের মধ্যেই দুই কিশোরীর সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। তাদের সঙ্গে ছবিও তুলেছে।

রামসাগরে কিছুক্ষণ না কাটতেই লাউডস্পীকার লাগিয়ে আকাশ ফাটিয়ে রেকর্ড বাজাতে বাজাতে পর পর বাস আসতে লাগল। সবগুলিই রিজার্ভ করা। সকলেই আসছে পিকনিক করতে। রামসাগরের চতুর্দিকে প্রচুর জায়গা পিকনিকের। যে যার পছন্দমত নেমে পড়ছে।

খেলার সময় এগিয়ে আসছে। স্নান, খাওয়া, বিশ্রাম, তারপর আবার খেলা। ডাকবাংলোয় ফিরে আবার রুটিন মাফিক কাজ।

অতিথি হয়ে গেলেও বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও কবাডি সংস্থা ফরিদপুরের মত এখানেও আমাকে একটি গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন। কাজ—খেলা শুরুর আগে টেপরেকর্ডারে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো।

দিনাজপুরের মাঠে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড ভিড়। লোক গিজ গিজ করছে। কবাডি কোর্টের কাছে লাউডস্পীকারের স্ট্যাণ্ড দেখে 'হ্যালো হ্যালো' টেষ্ট করছি অমনি ছুটে এলেন কয়েকজন।—আর মশায় এডা মাইক না। ভাবছেন ডা কি?

—আমি বললাম, দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজাবো এর সামনে।

—কইতাছি এডা মাইক না।

—তবে কি?

—এহান দিয়া খেলার রিলা হইব।

মুশকিলে পড়লাম। সব টেষ্টের আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়, আর এখানে তা হবে না? শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলির কাছে গেলাম। তিনি তাঁর সামনের মাইকটি দেখিয়ে বললেন, এটাই ব্যবহার করুন।

এদিকে বেতার ভাষ্যকার ব্যক্তিটি ছুটে এসেছেন।—মশায় চেনা চেনা মনে হইতাছে। থায়েন কই?

—কইলকাতা।

—করেন কি?

—রিপোর্টার।

—কোথায় দেখছি কন্ ত আগে?

জিজ্ঞাসা করলাম—কইলকাতা গিছিলেন কখনও?

—গতবার টেবল টেনিস টিম লইয়া গেছিলাম।

—ও! ডানলপে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপসে তাই না!

উনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ছাড়ার পর বললেন—আমাগো বাড়ি যাইতে হইব। না খাইয়া গ্যালে খুব দুঃখু পামু।

ভদ্রলোক রংপুরের অ্যাডভোকেট জনাব হামিদ। খেলাধূলায় আগ্রহী এবং টেবল টেনিসের সংগঠক। রংপুর বেতার কেন্দ্রের সব খেলার বেতার ভাষ্যকার।

খেলা শুরুর আগে শিক্ষামন্ত্রী সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, বাংলাদেশের নিজস্ব খেলা কবাডি আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করল ভারত ও বাংলাদেশের যুগ্ম চেষ্টায়। এর দ্বারা দুই দেশের মৈত্রী আরও দৃঢ় হবে।

আজ পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট। এর আগে একটিতে ড্র হয়েছে এবং তিনটিতে ভারত জিতেছে। তাই ভারত শেষ ম্যাচে হারলেও সিরিজ জয় সম্পর্কে কোনো ইতরবিশেষ হবে না। কিন্তু এদিন শুরু থেকে ভারতীয় দল অসম্ভব রকম আত্মরক্ষা করতে থাকে। বাংলাদেশ ও পরাজয় এড়াবার চেষ্টা করছিলই। দর্শকরাও অধীর আগ্রহে মারা বা ধরার জন্য অপেক্ষমান। নবম মিনিটে ভারত প্রথম পয়েণ্ট পায় বসন্ত সুদের হানায়। দ্বিতীয় পয়েণ্টটিও তারই সংগৃহীত। বিরতি পর্যন্ত ভারত দুটি পয়েণ্ট করল, বাংলাদেশ শূন্য।

শিক্ষামন্ত্রী, যার পরামর্শে বাংলাদেশ দল ইতিপূর্বে ভাল খেলেছে, তিনি আবার পরামর্শ দিতে গেলেন। ভারতীয় দলের ম্যানেজার বললেন, তাঁর খেলোয়াড়দের—এ ম্যাচে হারলেও লজ্জা নেই। সিরিজ ত আমাদের হাতে। তোমরা খেলা দেখাও। এই টেষ্ট সিরিজ জয় পরাজয়ের অপেক্ষা অনেক মহৎ উদ্দেশ্যে আয়োজিত। আমরা চাই কবাডির প্রসার। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট অপেক্ষা এই খেলা যে কোনো অংশে কম আকর্ষণীয় নয়—এটাই দেখাতে হবে।

বিরতির পরে বাংলাদেশ অন্য পন্থা নিল। ভারতের মত তারাও আজ কোল চড়াই চেপে দিল, যাতে ভারতের খেলোয়াড়রা এগোতে না পারে। আর এই পদ্ধতিতেই বাংলাদেশের প্রথম পয়েণ্ট হল (১—২)। তারপর হানাদার ধরে ২—২। দিনাজপুরের আকাশ বাতাস তখন যেন কেঁপে উঠেছে দর্শকদের উল্লাসে। ভারত তখনও আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। 'মারো' কিংবা 'ধরো' দর্শকরা এই-ই চান। জয় অথবা পরাজয়—এর বেশি কী হবে! ভারতের সহঃ অধিনায়ক এম সুভান্না উপর্যুপরি দুবার হানা দিয়ে ৪—২ এগোল। খেলার 'লাস্ট ফাইভ' মিনিট ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশের সহ অধিনায়ক মহম্মদ সালেক তখন জ্বলে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। সে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। একাই আজ খেলছে সালেক। কলকাতায় বাংলার অধিনায়ক ইনসান আলিকে দেখেছি—আজ সালেকের মধ্যে সেই একই খেলা চোখে পড়ল, দেখলাম পশ্চিমবঙ্গের প্রবীনতম পঞ্চাশোর্ধ জয়দেব নাথের বিক্রম এই মহম্মদ সালেকের খেলায়। তার দেহে যেন অসুর শক্তি আজ। শেষ দুই মিনিটে সে দুই ভারতীয় হানাদারকে উপর্যুপরি ধরে ৪—৪ করল। দর্শকরা তখন বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মাথায় তুলেছেন। বুকে টেনে নিয়েছেন সালেককে। এবং আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

শেষ টেষ্ট ড্র হলেও, নৈতিকতার দিক থেকে বাংলাদেশেরই জয় হল। আজ শেষ পাঁচ মিনিটেই দর্শকেরা কবাডি উপভোগ করছেন। গোটা ম্যাচে যদি অমন খেলা হত, সন্দেহ নেই এটিই হয়ত সিরিজের সেরা ম্যাচ হত। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের আত্মরক্ষার নীতিতে সব বানচাল হয়ে যায়। দিনাজপুরের দর্শকরা পূর্ণ আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলেন না।

আজ বাংলাদেশ দলে খেলে মকবুল হোসেন, মহম্মদ সালেক, জাহাঙ্গীর আলম, আমীর হোসেন, জুলফিকর আলি, আবুল হোসেন ও আব্দুল কাদের বীর

ভারতীয় দলে—শেখর শেঠি, এম সুভান্না, বসন্ত সুদ, এম এস বিচারে, জয়দেব সাঁতরা, এজাজুল্লা গৌরি ও শেখর পাতিল।

খেলা ত শেষ। এবার আমার খবর পাঠাবার পালা। গতকাল ভল্টেজ কম থাকয় টেলিফোন লাইন পাওয়া যায় নি। আজও কী তাই হবে ? ডাক বাংলোয় ফিরে ঢাকা লাইন পাওয়ার চেষ্টা করলাম। সব চেষ্টা বিফল। শুনলাম রাত ৯টার সময় পাওয়া যেতে পারে। মনে মনে বললাম, পেলে ভাল, তা নাহলে ঢাকায় গিয়ে খবর পাঠাব। একদিন দেরি হবে, কিন্তু উপায় ত নেই !

ডাক বাংলোয় ফিরে দেখি বেতার ভাষ্যকার সেই অ্যাডভোকেট ও বেতার কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অপেক্ষা করছেন। বসে আছেন আমাদের হাইকমিশন অফিসের মৈত্রবাবু। বেতারে ওরা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য ভারতীয় দলের ম্যানেজার, শেফ দ্য মিশন প্রমুখের ইণ্টারভ্যু রেকর্ড করতে চান। শেফ দ্য মিশন—সালভি, ম্যানেজার—অচিন্ত্যবাবু ও কোচ-ওয়ালঞ্জকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ইণ্টারভ্যু করা হল। শেফ দ্য মিশন বললেন হিন্দীতে, কোচ ইংরাজীতে ও ম্যানেজার বাংলায়। রংপুর বেতার কেন্দ্র থেকে পরে আধঘণ্টা ধরে ওই অনুষ্ঠান প্রচার করা হল।

ঢাকা থেকে দিনাজপুরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অনেক কম—দূরত্বের জন্য। ফরাকা ব্রীজ হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বেও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং-এর বাসিন্দাদের যেমন অনুযোগ ছিল—'আমরা অবহেলিত'—তেমনি অভিযোগ বাংলাদেশেও দিনাজপুর রংপুরের বাসিন্দাদেরও। অর্থনীতিতে বাংলাদেশের এই অঞ্চল হয়ত পিছিয়ে। কিন্তু মনের দিক থেকে তাঁদের অনেক উন্নত মনে হল।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল খেলোয়াড়দের সম্মানে নাট্য-সমিতিতে 'নবরূপী' কর্তৃক। বন্যা ও জীবনের দ্বৈত সঙ্গীত। ওস্তাদের মত চন্দনকুমারের গজল। কেয়া-সাহানার গান এবং ভাওইয়া গানগুলি

শুনে মনে হচ্ছিল কলকাতায় কোনো বড় জলসায় বসে অনুষ্ঠান শুনছি। অমন ভাওয়াইয়া, অমন পল্লীগীতি—'জলপাই পাইড়া দে'। বিশেষ করে পদ্মা—আমার মা, গঙ্গা—আমার মা-র শব্দ ও অর্থে আমার দেহ, মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সত্যিই গান দেশ, কাল, পাত্র মানে না। সাহিত্য ও খেলাধূলা যেমন, তেমনি ভাল সঙ্গীতেরও আন্তর্জাতিক বা সার্বজনীন আবেদন রয়েছে চিরকাল। দিনাজপুরের কিশোর কিশোরী ও তরুণ শিল্পীদের ওই অনুষ্ঠান ভোলার নয়। এত ভাল লেগেছিল যে নৈশভোজের পরে চন্দন কুমারকে দিয়ে আবার পৃথক সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

নৈশভোজের সময় সাড়ে ৯টা নাগাদ ঢাকার টেলিফোন লাইন পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেষ্টের খবর দিনাজপুর থেকে ঢাকা ও ঢাকা থেকে কলকাতায় পৌঁছে গেল। তখনই জানলাম পাকিস্তান স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে। কিন্তু তা নিয়ে ঢাকার নাকি কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। দিনাজপুরেও কোনো রিঅ্যাকশন দেখলাম না। এইদিন স্থির হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল পাকিস্তানে যাবেন সদলে মুসলিম কনফারেন্সে যোগ দিতে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি

আবার সব গুছিয়ে আবার বেরিয়ে পড়া। ফিরতে হবে ঢাকায়। ঠাকুরগাঁও থেকে প্লেন ছাড়বে ১টা ৫৫ মিনিটে। আমরা রওনা হলাম ১১টা ২০তে। পুরো দুটোদিন কাটেনি, তবুও সেই এক ঘনিষ্ঠতা। ছোট শহরের উপর মায়া পড়ে গেল। এরই মাঝে দেখা হয় বাংলাদেশের এম দত্তরায় বা বেচুবাবু বলে কথিত প্রবীন মনিরুজ্জমানের সঙ্গে। পুরনো দিনের নানা কথা শোনালেন তিনি।

হার্ট অফ দ্য সিটি-তে। কাজ না থাকলেও সময় অল্প। এতদিন কেটে গেল বাংলাদেশে, তবুও তাদের বিভিন্ন খেলার জাতীয় সংস্থা-গুলোর কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হল না। আজ ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ঢাকা স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়ামেই পাশাপাশি ওদের সব জাতীয় সংস্থার অফিস—কলকাতার মত ময়দানের যত্রতত্র বা এখানে ওখানে ছড়ানো-নয়। এতে ওখানকার সংবাদিকদের যেমন কাজের সুবিধা, তেমনি সুবিধা প্রত্যেকটি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের।

বিভিন্ন দফতরে গিয়ে কথা বলতে বলতে অনেক সময় কেটে গেল। রাত প্রায় ৯টা। ননীদা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমাদের। এদিকে অচিন্ত্যবাবু আর আমি ত রীতিমত মজলিস বসিয়েছি। ভুলেই গেছিলাম ননীদার বাড়ি যাওয়ার কথা।

চির কিশোর সাদা চুলের ননীদা খোঁজ পেয়ে একগাল হেসে বললেন, তোমার বৌদির দ্বারা শেষ বয়সে ডিভোর্স করাতে চাও নাকি! উত্তর দিতে অসুবিধা হল না। বললাম, সাংবাদিকরা বিয়ের পরদিন থেকেই অর্ধেক ডিভোর্স হয়ে থাকে, তারপর বাড়তি কোনো নেশা যথা—খেলা, গান, সাহিত্য বা অন্য কিছুতে একটু আগ্রহ থাকলে ত কথাই নেই। আমাদের বউরা খবরের কাগজকে সতীন মনে করেন। ননীদার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা দায়।

—তোমার বয়স কাঁচা এখনও আর দু—চারজনকে ম্যানেজ করতে পার। আমি কী এই বুড়ো বয়সে ....

—আপনার মনটা যে আমার চাইতে জুনিয়র ননীদা!

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ি ননীদার বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়েছে। উপরে উঠতেই যিনি অভ্যর্থনা জানালেন, তিনিই আমাদের বৌদি—ননীবৌদি। অভিনেত্রী শব্‌নমের গর্ভধারিনী।

ডাল, ইলিশ মাছ ভাজা, রুইমাছের ঝোল, মাংস, ঘি-ভাত, চাটনী পায়েস, মিষ্টি খেয়ে নড়াচড়ার জো রইল না। তবে শাহীদ ভায়ের মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া নেই খাওয়ার ব্যাপারে। আমার লোভ

ষোল আনা থাকলেও গ্রহণের সময় নিশ্চয়ই শাহীদ ভাইয়ের কাছেও ঘেঁষতে পারি না। খাওয়া দাওয়া ভাল, কিন্তু একটি সময় থেকে রেস্ট্রিকশন্ করা দরকার। বৌদি অর্থাৎ শাহীদ—ভাবীজিও বলেছিলেন, ওনার হাই প্রেসার তবুও খাওয়া কমান না, আপনারা কলকাতায় যাওয়ার আগে বলে যাবেন ত!

ননীদা আজ আমাকে আউট করে দিলেন। হোটেলে ফিরে সারারাত ঘুমোতে পারিনি। সমস্ত রাত অস্বস্তিতে কাটল বেশি খাওয়ার জন্য। মাঝরাতে সামান্য ব্যায়াম করতেই একটু স্বস্তি ফিরেছিল।

২৪ ফেব্রুয়ারি:

ব্রেকফাষ্ট স্থগিত রইল। কিন্তু এ এমন দেশ—একটি খাওয়া বাদ দিলে দুটি জুটে যায়। আগে থেকেই স্থির ছিল ব্রেক ফাস্ট হবে এম এ জলিলের বাড়িতে এবং আমরা যেন আটটা নাগাদ শহীদ মিনারের কাছে থাকি। উনি সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যাবেন সেখান থেকে। যাই নি শরীর ভাল না থাকায়। কিন্তু হোটেলে এসে চোখা চোখা এমন শব্দ ব্যবহার করলেন যে, তক্ষুণি যাত্রা করতে হল। শরীর খারাপের কথাতেও তিনি নিরস্ত হননি। বললাম, আপনার বাড়ি গিয়ে কিছুই খেতে পারব না।

বাঙালী বাঙালীর বাড়ি গিয়া কিছু খাইবেন না—এ কী বলছেন! ওঁর পায়ে পড়তে বাকি রইল। অচিন্ত্যবাবু বাঁচালেন খাওয়া থেকে। কিন্তু যেতে হল। জলিল—ভাবীজী ও তাঁর মেয়েরা, এবং একমাত্র পুত্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যেতেই সে কী আনন্দ! যেন অতি নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা। চমৎকার গান শোনাল জলিল ভাইয়ের মেয়েরা। রবীন্দ্রসঙ্গীত,

অতুলপ্রসাদ, নজরুল সঙ্গীত। এরপরে বাঙালীর আসল ব্যাপার—খাওয়া। খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ—পরিমাণ মত। আমি দূরে বসে শুধু গন্ধ শুকলাম। যা অবস্থা তাতে খাওয়া মানেই বমি হওয়া। কিন্তু কী যে হারালাম—কলকাতায় ফিরে তা বুঝি। তবে তখন অনেক অ-নে-ক দেরী হয়ে গেছে।

না খেলেও জলিল ভাই শুধু মুখে ছাড়েন নি। পেট গরম হয়েছে? ডাব কেটে দিলেন। সঙ্গেও পাঠালেন কয়েকটি। ভাবীজি সন্দেশের প্যাকেটে আর এক ডজন সবরী কলা গচিয়ে বললেন, শরীর ঠিক হলে খাবেন।

চমৎকার মানুষ এই এম এ জলিল। খেলাধূলা নিয়েই থাকেন। ইংল্যাণ্ড থেকে শারীর শিক্ষার ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। বহুদিন সেখানে ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাঙালত্ব একটুও কমেনি। খাওয়ায়, চলায়, কৃষ্টিতে পুরোপুরি বাঙালয়ানা।

কেউ আর লাঞ্চ খেলাম না। স্নান সেরে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে যাবো—অমনি এসে পড়লেন ঢাকার কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু—বদিউজ্জামান, জাবেদ প্রমুখ।

—ঘুমাইয়া কী হইব, কাল ত চলে যাবেন। দুড়ো কথা কই আজ। নানা আলোচনায় বিকাল হয়ে গেল। এলেন বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কাজী আনিস্থুর রহমান ও এম এ হামজা। তাড়া দিলেন তাঁরা—আপনাগো সময় জ্ঞান বড্ড কম। সবদিন লেট হইয়া যান। আজ রাইট টাইমে খেলা হইব। টেলিভিশন, রেডিওর প্রোগ্রাম আছে। সময় মতন আরম্ভ করনের দরকার।

২৪ ফেব্রুয়ারি সিরিজের শেষ খেলা হল ভীষণ দ্রুত। দুই দলই মারতে ও মরতে মরীয়া হয়ে ওঠে শুরু থেকেই।

ভারতীয় খেলোয়াড়রা এক তরফা ১—০, ২—০, ৩—০ এগিয়ে গেলে বাংলাদেশ এক হানাতে ২—৩ করে। তারপর ৩—৩। অতঃপর ভারত ১৩—৩ এগিয়ে যায়। বিরতি পর্যন্ত ভারত—৯,

বাংলাদেশ—৯। এর কিছু পরেই ভারতের সহ অধিনায়ক এম সুভান্নার কপাল কেটে যায় ও তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সদা হাস্যময়ী সুভান্নার হাসি মুখ তবুও মলিন হয়নি। তখন ভারতের ২২, বাংলাদেশের ১২। খেলা শেষ হয় ২৮—১৫য়। জিতল ভারত।

ভারতীয় দলে খেলল—শেখর শেঠি, এম সুভান্না, বসন্ত সুদ, এম এস বিচারে, জয়দেব সাঁতরা, এজাজুল্লা গৌরি, শেখর পাতিল, এ বিশ্বনাথন ও নিশাকর চক্রবর্তী।

বাংলাদেশ দলে খেলে—মকবুল হোসেন, মহম্মদ সালেক, রোস্তম আলি, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল রশীদ, মেশের আলী ও বিল্লাল হোসেন।

রেফারি—এম এ হামজা। আম্পায়ার—জেড এ আলম ও মধুসূদন দাস সরকার।

খেলা শেষ হল কিন্তু মনটা খারাপ লাগছিল সুভান্নার জন্য। গোটা সফরে মাঠের বাইরে ও ভিতরে ওর মত স্পোর্টিং ছেলে ভারতীয় দলে আর ছিল না। রেফারি, আম্পয়ারের কোনো ভুল সিদ্ধান্তেরও সে প্রতিবাদ করেনি। হানা দিতে গিয়ে যেমন হাসি মুখ, তেমনি ধরা পড়ে বা বিপক্ষ হানাদার এলেও হাসিমুখ। এই ক'দিন সে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেই সুভান্না আহত হল, তাও শেষ দিনে? খুব খারাপ লাগছিল, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়াটা। হাসপাতালে যাবো—ঠিক করেছি, বাধা দিলেন অচিন্ত্যবাবু। বাংলাদেশের লোকেরা রয়েছেন, সঙ্গে আছে নিশাকর। মোটেই ভাবতে হবে না। স্টেডিয়ামে ড্রেসিংরুম ছেড়ে হোটেলে ফিরতে যাচ্ছি—নিশাকর এল। নিশাকর বলল, সুভান্না ঠিক আছে, রক্ত বন্ধ হয়েছে। এখনও জিজ্ঞাসা করছে—রেজাল্ট কি? জিতেছি ত? নিশাকরের নিজস্ব হিন্দিতে ওকে তখন জানায়—বহুৎ পয়েন্টকা ব্যবধান মে জিতা হ্যায়। তাজ্জব হলাম নিশাকরের মুখে ঢাকার চিকিৎসকদের তৎপরতার কথা শুনে।

সুভান্নাকে বিভিন্নভাবে এক্সরে করা হয়েছে, আঘাত গুরুতর নয়।

—এক্সরে প্লেট না দেখেই কেমন করে জানলে ?

—এক্সরে প্লেট দেখেই ডাক্তারবাবুরা বলেছেন। এক্সরে করার দশ মিনিটের মধ্যেই এখানে প্লেট পাওয়া যায়।

—দশ মিনিটের মধ্যেই ?

নিশাকর গম্ভীর গলায় জানাল—এটা ঢাকা, কইলকাতা নয়।

যত সময় কাটছে, মন তত খারাপ হচ্ছে। কাল ২৫ তারিখে এতক্ষণ আর বাংলাদেশে নেই। থাকব কলকাতায়। সাগর হোটেলে এসে ওই কথাই জানিয়ে গেল। বলল, আম্মা আর আব্বার সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গেছি, কিন্তু ইণ্ডিয়ায় যাই নাই। কলকাতা দেখি নাই। অথচ কত কাছে! ওর একের পর এক প্রশ্ন—কলকাতা কত বড়—ঢাকা থেকে। কী কী দেখার জিনিস আছে ইত্যাদি।

সারা বাংলাদেশে সবচেয়ে মন কেড়ে নিয়েছিল এই বালকটি। ঢাকায় থাকলে বাড়িতে না বলে সোজা চলে আসত আমাদের হোটেলে। বাড়িতে খোঁজ খোঁজ পড়ত। প্রথম যেদিন সে পালিয়ে এসেছিল, রীতিমত ভীত ছিল। ওর বাবা শাহীতুল ইসলাম মারধোর করতে পারেন বলে। আমাকেও অচিন্ত্যবাবুকে সেদিন ত্রাণ কর্তার ভূমিকা নিতে হয়েছিল। তারপর 'হারিয়ে' গেলে ওর বাড়ি থেকে প্রথম ফোন আসত আমাদের কাছে—সাগর আছে ওখানে ?

সাগর আর একদিন অবাক করেছিল ওর বাবা, মা, কাকা ও কাকীকে। আড়াল থেকে সে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা আম্মা আমি কোন্ দেশের নাগরিক ?—জন্ম পূর্বপাকিস্তানে, এখন আছি বাংলা-দেশে। নাগরিত্ব তা হলে কোন্ দেশের ?

—বাংলাদেশের নাগরিক তুমি।

সাগর তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে বলে—মোটেই না। আমি

ভারতের নাগরিক। সাগরের গায়ে তখন ভারতীয় কবাডি দলের ব্লেজার, টাই ও ব্যাজ। সাগর গর্বকরে সকলকে ওগুলো দেখাল।

সাতটা বাজতেই আবার স্টেডিয়ামের দিকে রওনা হলাম। স্টেডিয়ামের উপরের হলে বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দুই দলের খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা জানাবন, তারপর নৈশভোজ।

সারা হল গম্ গম্ করছে। দুই দল ত আছেই। এসেছেন সাংবাদিকরা, টেলিভিশন ও বেতারের সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অসংখ্য কর্মী, ভারতীর হাই কমিশনের কয়েকজন অফিসার। অর্থমন্ত্রী—জনাব তাজউদ্দীন, চীফ হুইপ—শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

অর্থমন্ত্রী বললেন, ১৯৫২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় দুই দেশের মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, এই টেস্ট সিরিজ তারই অঙ্গ। ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধূলার মাধ্যমেও সেদিনকার সেই চুক্তিকে বাস্তবরূপ দেওয়া আমাদের সকলের পরম কর্তব্য।

চিফ হুইপ বললেন, সাহস, বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন কবাডি খেলায়। দুই দলের খেলাতেই তার প্রমাণ মিলেছে। অনুষ্ঠানে কাজী আনিসুর রহমান, এম এ হামজা টেস্ট সিরিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। ভারতের পক্ষ থেকে এস এন সালভি ও অচিন্ত্য সাহা বাংলাদেশের আতিথেয়তাকে 'অভূতপূর্ব' বলে বর্ণনা করেন। অচিন্ত্যবাবু বললেন, প্রথম আন্তর্জাতিক কবাডি টেস্টের আয়োজন দ্বারা বাংলাদেশ ইতিহাস রচনা করল।

অবশেষে বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার দেওয়া উপহারগুলি অর্থমন্ত্রী তুলে দিলেন সকলের হাতে। সালভিও ভারতের পক্ষ থেকে কিছু সামগ্রী দিলেন বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে।

নৈশ ভোজের পর ফিরলাম হোটেলে। বিদায়ের সুর বেজে ওঠায় মনটা ভারী হয়ে গেল। এ অবস্থ শুধু আমার বা ভারতীয় খেলোয়াড় বা কর্মকর্তাদের নয়। বাংলাদেশের ওঁরাও রীতিমত মুষড়ে পড়েছেন। হোটেলে এলেন সাহেব আলি, শাহীদুল ইসলাম, আবুল হাসানাত ও তাঁর ছেলে জমিল। আনিসুর রহমান ও এম এ হামজা ত রইলেন মাঝ রাত পর্যন্ত। ওঁরাও আমাদের ছাড়তে পারছিলেন না, আমরাও চাইছিলাম আজ ২৪ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপূজোর নবমীর নিশি হোক। যেন তেন প্রকারে একে আটকে রাখি। কিন্তু তা কী কখনও হয়? রাতে ঘুম হল না। অচিন্ত্যবাবু বিছানা থেকে উঠে বসলেন—কলকাতায় গিয়ে কাটাবেন কেমন করে? সালভি দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে এসে ধপ্ করে বসে পড়ে বললেন—ঘুম আসছে না। দিল্ আচ্ছা লাগ্‌তা নেহী।

আমি ওকে ডি এল রায়ের গান শোনালাম—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি…

২৫ **ফেব্রুয়ারি**

ভোরে উঠে ফেরার প্রস্তুতি শুরু হল। গত ষোলদিন ধরে যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছি, যারা আমাদের আপন করে নিয়েছেন সেই মুখগুলি আমার মানসপটে এসে ভিড় জমাতে লাগল। কেউ কেউ হাজির হলেন 'পূর্বাণী'-তে আমাদের ঘরে।

এদিকে সকালেই প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন শেফ দ্য মিশন—সালভি ও ম্যানেজার—অচিন্ত্যবাবু। ঢাকার প্রতিটি দৈনিক পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন এবং নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধি বা এলেন। কোচ-ওয়ালঞ্জ ওদের এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন: নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সেরা খেলোয়াড় জাহাঙ্গীর আলম। সালভি ও অচিন্ত্যবাবু গোটা

সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন এবং জানালেন: এই উপমহাদেশের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কবাডি, খো-খো প্রভৃতি স্বল্প ব্যয়ের খেলাই প্রচারিত হওয়া উচিত। বললেন: ভারত এই খেলার প্রসারে ও প্রচারে সর্বদাই বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে কবাডি ঘিরে গত দুই সপ্তাহাধিককাল যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছিল; উভয়েই সেজন্য বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, কবাডি সংস্থা এবং লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ামোদীকে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, এরপর বাংলাদেশ কবাডি দল পাল্টা সফরে যাবে ১৯৫৫-এ ভারতে।

প্রেস কনফারেন্স শেষে দ্রুত তৈরী হতে হল। স্নান, আহার শেষে চলে গেলাম সেই মিস মাফিটের কাছে। অসংখ্য ধন্যবাদ মিস মাফিট। গত ক'দিন তোমাকে ভীষণ জ্বালিয়েছি। তিনি ছুটে এলেন আমাদের ঘরে। আবার যেন বাংলাদেশে যাই এবং তাঁর সঙ্গে যেন যোগাযোগ করি। তিনি সাবধান করে দিলেন, হোটেল ছাড়ার আগে অবশ্যই সব কিছু দেখে শুনে নেবে। অভয়ও দিলেন, কিছু ফেলে গেলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হারানো জিনিস পেতে অসুবিধা হত না।

ভারতীয় দলের অভিভাবক বাংলাদেশ বিমানের তরুণ কর্মী জামিল ভাই চটপট নিচে নামার নির্দেশ দিয়ে বললেন: আর দেরি নয়, ছুটোয় এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং টাইম।

৯ ফেব্রুয়ারি যে পথ ধরে ঢাকায় এসেছিলাম আজ আবার সেই পথে ফিরে যাচ্ছি। বিদায় পূর্বাণী, বিদায় ঢাকা স্টেডিয়াম, বিদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদায় রমনা ময়দান। দ্রুত তেজগাঁও বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। সেখানে আবার সেই চেনা মুখগুলো। আমরা মেহমান বন্ধু রাষ্ট্রের লোক—আইনের চোখেও আমরা কী তাই?

—নিশ্চয়ই। তা না হলে বাংলাদেশের শুল্ক বিভাগ কিছু না জিজ্ঞাসা করেই ছেড়ে দেবেন কেন? ইতিমধ্যে হাসানাত ভাই

পলিথিনের প্যাকেটে করে একটি গোটা ইলিশ এনে বললেন, 'কিছু দিতে পারলাম না—এটা কলকাতায় নিয়ে যান'। কোনো কথা বলার আগে ওটি ঢুকিয়ে দিলেন ব্যাগে। আরও অবাক করল, জাহীদ। বড় হাতলওলা একটি বাস্কেট। "এডা নিয়ে যাতি হবে। যশোহর থেকে কিছু পাটালি আনছিলাম, কলকাতায় নিয়ে যাবেন বলে।" ওঁর ফটোগ্রাফার বন্ধু দিলেন, গত রাত্রে স্টেডিয়ামের হলে সংবর্ধনার কিছু ছবি।

আমি তখন খুঁজে বেড়াচ্ছি শুধু সেই বালকটিকে যার 'চাচা' ডাক বহু কাল আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে আঘাত করে যাবে।

—সাগর আসেনি ?

—ওর শরীর খারাপ গাড়িতে শুয়ে আছে, বললেন ওর বাবা শাহীতুল ইসলাম।

সাগরের চাচা—জাহীদের সঙ্গে গিয়ে দেখি সে ঘুমোচ্ছে। দুপুরে স্কুলে গিয়ে কয়েকবার বমি করেছিল। শরীর ভাল না। কিন্তু আমরা কলকাতায় ফিরে আসব, সে তা জানত এবং জানত বলেই অসুস্থতা সত্ত্বেও বাড়ি ফিরে আম্মাকে বলে, "আমি এয়ারপোর্টে যাবো ইণ্ডিয়ান চাচাদের বিদায় জানাতে।"

গাড়িতে গিয়ে—সাগর সাগর বলে ডাকলাম। সাগর উঠল না। বিরক্ত না করে ফিরে এলাম। রানওয়ের কাছে অপেক্ষা করছি প্লেনের জন্য। হঠাৎ সে হাজির। ওর বাবা বকলেন। কিন্তু সাগর কোনো কথা না কয়ে যে ফিরবে না।

রানওয়েতে প্লেন এসে দাঁড়িয়েছে। তখন প্রায় সাড়ে তিনটা। এবার বিদায়ের পালা। কিন্তু এ কেমন দৃশ্য। বাংলাদেশের অধিনায়ক মকবুলের চোখ টলটল করছে। প্রবীণ আবুল হাসানাত চোখ মুছছেন। এম এ হামজা, আনিসুর রহমান কাঁদছেন আর বলছেন, "কাল থেকে আমরা কী নিয়ে থাকব।" বুকে জড়িয়ে ধরলেন শাহীতুল ইসলাম। ওঁর কণ্ঠ রুদ্ধ। কিন্তু সায়েব আলি যখন

বললেন, "মনে কিছু ব্যথা দিয়া থাকলে, আমাদের কোনো ক্রুটি হইলে আমাদের ছোট ভাই বইলা ক্ষমা কইরেন"—আমরা তখন স্থির থাকতে পারিনি। কালুভাই বোধ হয় নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, "আমি ত মাঝে মাঝে কইলকাতায় যাই।" জাহীদ কোলাকুলি করতে গিয়ে আমাদের ছাড়তে চাইছিল না।

আর ওই বালকটি? সাগরের চোখে জল নেই, মুখে কথা নেই। সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে ওঠার সময় সকলে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন, কিন্তু সাগর হাত তুলল না। অপলক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। প্লেনের ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে। আমরা কোমরের বেল্ট বেঁধে নিলাম। বাংলাদেশ বিমানের পক্ষ থেকে আবার বাংলা ঘোষণা—আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। ধীরে ধীরে প্লেন রানওয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জানলা দিয়ে তাকাতেই চিনতে অসুবিধা হল না। নিচে কেউ কেউ মুখ ফিরিয়েছেন, কেউ কেউ তখনও আমাদের প্লেনের দিকে হাত নাড়ছেন। কিন্তু সেই বালকটি একইভাবে দাঁড়িয়ে। ওর চোখ, ওর মুখ, ওর হৃদয় কী বলতে চেয়েছিল? যেতে নাহি দিব? আমার ভিতরটা তখন গুমরে উঠছে, যেমনটি মনে হয় অতি প্রিয়জনকে ফেলে বহুদিনের জন্য দূরে কোথাও গেলে।

অনেক জায়গায় ত গিয়েছি, কিন্তু কেন এমন হল এই ক'দিনের জন্য বাংলাদেশে গিয়ে?

———